গণবিজ্ঞান ভাবনার পত্রিকা

বিজ্ঞান অন্বেষক

বর্ষ - ১৫ সংখ্যা-১ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৮ WBBEN/2003/11192 মূল্য : ১৫ টাকা

আমাদের কথা

কুঁজোরও চিৎ হয়ে শুতে ইচ্ছে করে। অনেকেই দিবাস্বপ্ন দেখে। আমরাও দেখি। আমাদের স্বপ্ন—ছাত্রছাত্রী ও সকলকে অল্প মূল্যে অথচ বেশি পৃষ্ঠাসংখ্যায় রঙিন ঝকঝকে আকর্ষণীয় বিজ্ঞান পত্রিকা উপহার দেওয়া। কিন্তু প্রতিবন্ধক—কাগজ ও ছাপার অত্যধিক খরচ। তবু এই একটি বিশেষ সংখ্যায় রঙিন প্রচ্ছদ সহ ২৮ পাতার পত্রিকা প্রকাশ করা হল। এটি অবশ্যই আনন্দ সংবাদ।

কিন্তু এই আনন্দ ফিকে হয়ে যায়। যখন উপরের নিকলসনের মেরু ভালুকের সাম্প্রতিক ছবিটির দিকে তাকাই। হাড় জিরজিরে রোগা মেরু ভালুকের দর্শন এই প্রথম। এই প্রাণীর প্রধান খাদ্য সিল, বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে বরফ গলনের কারণে ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। উষ্ণায়নের এই পরিণতি পৃথিবীর প্রায় সমগ্র জীবজগতের ক্ষতি করছে। তাইতো মহাবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং বলে উঠলেন— "পৃথিবীর আয়ু আর ১০০ বছর।"

এই প্রেক্ষিতেই, আমাদের স্বপ্নের—যত বেশি মানুষের কাছে বিজ্ঞান পরিবেশ চেতনাকে পৌঁছে দেওয়া যায় তার সার্থকতা। এই চেতনাকে পাথেয় করে যদি পরিবেশ ধ্বংসের গতিকে কমিয়ে দেওয়া যায়, যদি কাঠবিড়ালী-চেষ্টায় অতিরিক্ত কয়েকটি বছর পৃথিবীর আয়ুকে বাড়িয়ে দেওয়া যায়—তাও কম কি?

বাংলার বিষধর সাপেরা

রাজা রাউত

কেউটে *গোখরো* *শঙ্খচূড়* *কালাচ* *শাঁখামুটি* *চন্দ্রবোড়া*

সারা পৃথিবীতে প্রায় ২৫০০ প্রজাতির বিভিন্ন সাপ পাওয়া যায় যার মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ সাপই কেবলমাত্র বিষধর, বাকি ৮৫ শতাংশই নির্বিষ। প্রতিবছর গড়ে ৫০-৬০ হাজার মানুষ মারা যান সাপে কাঁটার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণে—আমাদের দেশে। একইভাবে, পশ্চিমবঙ্গে বহু মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন কুসংস্কার, ভীতি—সাপ সম্বন্ধে সঠিক ধ্যান ধারনার অভাবে এবং সর্বোপরি, সুষ্ঠু ও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার সরকারি অবহেলা এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যে দায়বদ্ধতার অভাব প্রভৃতি কারণে। পৃথিবীতে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশেই সবচেয়ে বেশি বিষাক্ত সাপ ও অন্যান্য বিষাক্ত প্রাণীদের বসবাস অথচ সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যায় আমাদের দেশেই। পৃথিবীর অন্যতম প্রথম তিনটি উগ্রবিষযুক্ত সাপের বাসও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশেই।

বিষধর সাপেরা প্রধানত চারটি পরিবারের সদস্য যথা—Elapidae, Viperidae, Hydropidae এবং Colubridae। ঘটনাচক্রে উপরোক্ত চারটি পরিবারের প্রথম তিনটি আমাদের বাংলার বাসিন্দা।

এক ঝলকে বাংলার বিষধর সাপেরা

সাপের চলতি নাম	সাধারণ ইংরাজি নাম (বিজ্ঞান সম্মত নাম সহ)	মারণ মাত্রা (মানুষের ক্ষেত্রে)
১. কেউটে/পদ্ম কেউটে/ আল কেউটে/গেঁড়ি কেউটে দুধরাজ/কলি কেউটে/ ভাঙা তঁপঃ/ফনাক্/ কেউটিয়া প্রভৃতি	Indian Cobra (Monocellate) cobra (Bengal Cobra) (Naja kaouthia)	১৫ মিঃগ্রাঃ
২. গোখরো/গোক্ষুর/ খড়িশ/গোমা/কালি/ গোখরো/তঁপ/ নাগ	Common Cobra/Spectacled Cobra/Binocellate Cobra (Naja naja)	১৫ মিঃগ্রাঃ
৩. শঙ্খচূড়/নাগরাজ	King Cobra (Ophiophagus hannah)	১৫ মিঃগ্রাঃ
৪. কালাচ/ডোমনা চিতি/ কাল চিতি	Common Krait (Bungarus caeruleus)	২.৫ মিঃগ্রাঃ
৫. শাঁখা মুটি/শঙ্খিনী/ রাজসাপ/মামা ভাগ্নে/ সাকাতি/রাণা সাপ/ সাগিনী/বত্রিশ মুঠি, জলঢোঁড়া/ পানচিতি/ পানি চিতি প্রভৃতি	Banded Krait (Bungarus fasciatus)	১০ মিঃগ্রাঃ
৬. চন্দ্রবোড়া/উলুখাড়া/ রক্তছুটে/ কান্দের	Russel's Viper {Daboia = (Vipera russelii}	৪২ মিঃগ্রাঃ
৭. গেছোবোড়া/সবুজ বোড়া	Green Pit Viper/Pit Viper (Trimevesurus erythrurus)	১০০ মিঃগ্রাঃ
৮. সামুদ্রিক সাপ/চঞ্চু সামুদ্রিক সাপ/হুক নাকওয়ালা সামুদ্রিক সাপ	Common Sea Snake/ Beaked Sea Snake/Hook Nosed Sea Snake (Enhydrina schistosa)	১.৫ মিঃগ্রাঃ

মন্তব্য : উপরিউক্ত ক্রমিক সংখ্যা ১ থেকে ৫ ইলাপিডি, ৬-৭ ভাইপেরিডি এবং ৮ নং হাইড্রোপিডি গোত্রের অধীনে পরে।

সাপের বিষ

সাপ মাত্রই 'বিষাক্ত' বা 'ক্ষতিকারক' এই ধারণা যেমন ভুল, আবার সাম্প্রতিক কালে এও প্রমাণিত হয়েছে যে বিষ বা 'Venom' কমবেশি সমস্ত সাপেরই থাকে। তথাকথিত 'বিষাক্ত' সাপে অধিক মাত্রায় বিষের এবং বিষদাঁত (Fang)-এর উপস্থিতি এদেরকে ভয়ঙ্কর করে তুলেছে।

সাপের 'বিষ' আদতে উৎসেচক সহ দুই বা ততোধিক প্রোটিনের মিশ্রণ। অম্লধর্মী এই বিষে ভারী আনবিক গুরুত্বের উৎসেচক ও প্রোটিন অনুর সাথে কিছু পরিমাণে তামা, গন্ধক, দস্তা, অ্যান্টিমনি, আর্সেনিক প্রভৃতি মৌল উপস্থিত। উৎসেচক হিসেবে প্রধানতঃ প্রোটিয়েজ, হায়ালুরোনিডেজ, ট্রান্স অ্যামিনেজ, অ্যাসিড ফসফাটেজ প্রভৃতি উপস্থিত। এছাড়া এর মধ্যে কিছু অধিবিষ (toxin) উপস্থিত যথা নিউরোটক্সিন, হিমাটক্সিন, সাইটোটক্সিন বা মায়োটক্সিন প্রভৃতি। নিউরোটক্সিন সাধারণতঃ স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে—স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক কাজে বাধা দেয়। কেউটে, গোখরো, কালাচ, শাঁখামুটি প্রভৃতি সাপের ক্ষেত্রে এইরূপ 'বিষ' দেখা যায়। 'হিমাটক্সিন' প্রকৃতির বিষ মূলত রক্ত সংবহনতন্ত্রকে নষ্ট করে দেয় ফলে লোহিত রক্ত কণিকাগুলো বিনষ্ট হয়---শ্বাসকষ্ট হয় এবং শরীরের তুলনামূলকভাবে নরম জালক/শিরা/ধমনী ফেটে বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত ঝরতে দেখা যায়—কাটা অংশ বাদেও। চন্দ্রবোড়া কিংবা গেছো বোড়ার ক্ষেত্রে এটি দেখা যায়। 'মায়োটক্সিন' মূলতঃ পেশীতন্ত্রকে ব্যাঘাত ঘটিয়ে অকেজো করে তোলে—সামুদ্রিক সাপের ক্ষেত্রে এটি অধিক দেখা যায়।

সাধারণভাবে সাপের বিষ সাপের খাদ্য পাচনে এবং আত্মরক্ষায় ব্যবহৃত হয়। ঋতুভেদে বিষের সান্দ্রতা (viscocity) হ্রাসবৃদ্ধির ফলে এর তীব্রতারও হেরফের হয়। আবার, প্রাণীভেদে সাপের এই বিষের সহনমাত্রাও বিভিন্ন।

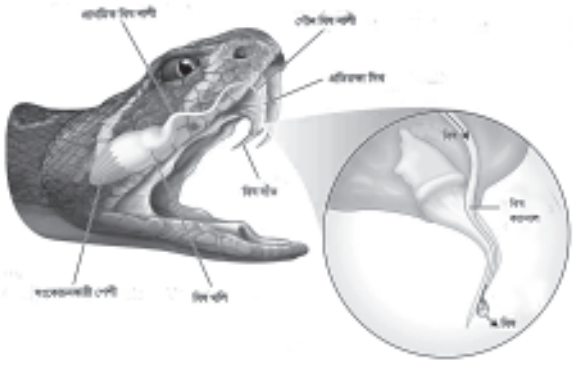

বস্তুতঃপক্ষে, সাপের গালের ভিতরে এক জোড়া লালাগ্রন্থি 'বিষগ্রন্থি'তে রূপান্তরিত হয়। দেখতে স্বচ্ছ, চট্‌চটে হাল্কা—হলুদাভ বর্ণের তরল পদার্থ। যার শতকরা ৬৫-৭০ শতাংশই জল। এতে ৯৫ ভাগ প্রোটিনের সাথে রয়েছে কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড, নিউক্লিওটাইড, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড জাতীয় লবণ। ভাইপার জাতীয় সাপের বিষে থাকে 'ভ্যাসপুলো টক্সিন' যা রক্তকে জমাট বাঁধতে বাঁধা দেয়।

বিষদাঁত (Fang)

বিষধর সাপের উপরের চোয়ালের (Maxilla) বাইরের সারিতে দুটি বেশ বড় দাঁত থাকে। এই দুটি দাঁতের ঠিক পেছনে আরও কয়েকটি ছোট ছোট সারিবদ্ধ বিষ দাঁত থাকে। সাধারণভাবে ঐ বড় দাঁত দুটিকেই 'বিষদাঁত' বা 'Fang' বলে। সক্রিয় বড় দাঁতটি কোন কারণে ভেঙ্গে গেলে, তার পাশে অবস্থিত এই ক্ষুদ্র অথচ নিষ্ক্রিয় বিষদাঁত বড় ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। সময় নেয় ২০ থেকে ৪০ দিন। এই 'বিষদাঁত' সম্মুখদন্তী সাপ ও পশ্চাৎদন্তী সাপের জন্ম দেয়। কেউটে, গোখরো, কালাচ, চন্দ্রবোড়া প্রভৃতি সাপের বিষদাঁত সম্মুখদন্তী। আবার, শঙ্খিনী ও সামুদ্রিক সাপের বিষদাঁত পশ্চাৎদন্তী।

বিজ্ঞানীরা গঠন ও প্রকৃতি অনুযায়ী বিষদাঁতকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। ভাইপার জাতীয় সাপের বিষদাঁত অনেকটা ইঞ্জেকশন সূঁচের মত ছিদ্রযুক্ত। এই জাতীয় দাঁত সাধারণতঃ স্বাভাবিক অবস্থায় মাংসাল পটি দিয়ে ঢাকা থাকে এবং গলার দিকে ভাঁজ করা থাকে।

এদের মাথায় একজোড়া বিষথলি থাকে চোখের ঠিক পেছনে যেখান থেকে একটি করে মোট দুটি বিষনালী বিষদাঁতের গোড়ায় উন্মুক্ত। ফলে, বিষথলিতে চাপ পড়লে নালী দিয়ে বিষ দংশন স্থানে গিয়ে পড়ে। বার বার দংশনের ফলে কিংবা অন্য কোন কারণ বিষথলির 'বিষ' নিঃশেষ হয়ে গেলে পুনরায় ৮-১০ দিনের মধ্যে বিষথলি ভরে যায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ঋতুভেদে কিংবা একই জাতের ও বয়সের দুটি সাপের দুটি বিষথলির বিষের পরিমাণ, ঘনত্ব ও বর্ণ তারতম্যযুক্ত হয়। কি পরিমাণ বিষ ঢুকল, কোন ঋতুতে, সাপের স্ত্রী-পুরুষ ভেদে, আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক ক্ষমতা এবং তাঁর বয়স প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর মানুষের মৃত্যু হার নির্ভর করে।

বলাবাহুল্য, সাপের বিষ মূলতঃ প্রোটিন ধর্মী হওয়ায় দেহের কোন অংশে লাগলে কিংবা কেউ খেলে কোন ক্ষতি হবে না যদি কিনা দাঁতের গোড়ায়, মুখে, খাদ্যনালী কিংবা বা অন্য কোন স্থানে কোনও ক্ষত থাকে। এর বিষ একমাত্র রক্তের সংস্পর্শে এলেই বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে।

নির্বিষ ও বিষধর সাপের ক্ষতচিহ্নের পার্থক্য

নির্বিষ কিংবা বিষধর সাপে কামড় দিলে ক্ষতস্থানের চিহ্ন দেখে সহজেই বোঝা যাবে যে, সাপটি বিষধর না নির্বিষ এবং সেই বুঝে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

নির্বিষ সাপের ক্ষেত্রে : নির্বিষ সাপে কামড়ালে ক্ষতস্থানে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি দাঁতের সারি সমান্তরালভাবে পাওয়া যায়। স্থানটি সহজে ফুলে ওঠে না।

০°°°°০ নির্বিষ সাপের বেলায় ক্ষতচিহ্ন

বিষধর সাপের ক্ষেত্রে : বিষাক্ত সাপে কামড়ালে ক্ষতস্থানটি তৎক্ষণাৎ ফুলে উঠবে। ক্ষতস্থানে এক বা দুটি বড় বড় ক্ষতচিহ্ন থাকবে, রক্ত ঝড়বে। সাথে আনুষঙ্গিক উপসর্গ তো থাকবেই। দাঁতের কোন সমান্তরাল সারি পাওয়া যায় না। দুটি চিহ্নের মাঝখানে মোটামুটি ১ ইঞ্চি ফারাক থাকে।

০ ০ বিষাক্ত সাপের বেলায় ক্ষতচিহ্ন

এটা খুব সত্য যে আজও সাধারণ মানুষ বিশেষ করে গ্রামীন এলাকায় বসবাসকারী মানুষ অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা (চিকিৎসা) গ্রহণ করতে পারেন না। নির্ভর করতে হয় ঝাড়ফুঁক, তুক্‌তাক্ প্রভৃতির উপর। পরিণতিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মৃত্যু ঘটে।

সাপ কামড়ালে কি করবেন?

সবার প্রথমে RIGHT কথাটি মনে রাখার চেষ্টা করুন। অর্থাৎ
R- Reassure (রোগীকে আশ্বস্ত করুন)
I- Imobilise (অর্থাৎ, জায়গাটির নড়াচড়া বন্ধ)
G- Go (যাও)
H- Hospital (হাসপাতালে)
T- Tell the Doctor (চিকিৎসককে পুরো ঘটনাটি বলুন)
যেগুলো করতে হবে—

* রোগীকে ক্রমাগত আশ্বস্ত করুন।
* নিকটবর্তী সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র/হাসপাতালে যত দ্রুত সম্ভব নিয়ে যেতে হবে রোগীকে।
* যতটা সম্ভব নড়াচড়া করবেন না।
* তাড়াতাড়ি যেতে হলে মোটর সাইকেলও একজন ধরে নিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া যায়।
* রোগী যেন হেঁটে/দৌড়ে না যায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।
* চিকিৎসককে সাঠিক তথ্য দিন। সাপটি চিনতে পারলে নাম বলুন/বর্ণনা দিন।
* বিভিন্ন লক্ষণগুলি ঠিকমত জানান।

সাপের কামড়ের চিকিৎসার আচরণবিধি (Snake bite Treatment Protocol)

সাপ কামড় বা যেকোন সন্দেহজনক কামড়ের রোগী হাসপাতালে এলেই তাকে ভর্তি করে নিতে হবে।

প্রথমেই একটি সাধারণ স্যালাইন আস্তে আস্তে চালিয়ে দেওয়া হয়। আর দেওয়া হয় একটি টিটেনাস ভ্যাকসিন। রোগীর শ্বাসকার্য ঠিকমতো চলছে কিনা দেখে নিতে হবে। এ ব্যাপারটি সবার আগে দেখা দরকার।

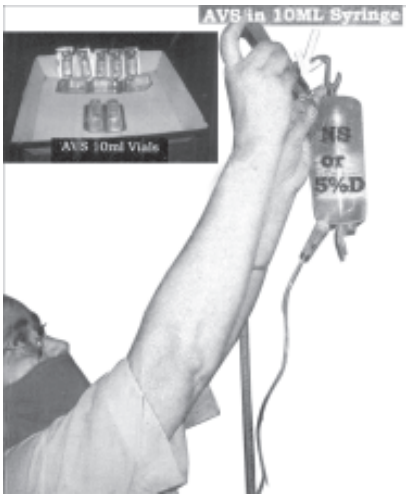

এরপর আমাদের দেখা দরকার কোনরকম বিষের লক্ষণ আছে কি না। প্রচন্ড ব্যথা আর ক্রমবর্ধমান ফোলা থাকলে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় বিষধর সাপে কামড়েছে। দ্রুত ০.১৫ মিলি অ্যাড্রেনালিন ইনজেকসন চামড়ার তলায় দিতে হবে এবং বাকি অ্যাড্রেনালিন ইনজেকসন সিরিঞ্জে টানা থাকবে, **সঙ্গে সঙ্গে ১০টি এ ভি এস ঐ চালু স্যালাইনের বোতলে মেশানো হবে। এবার ঐ এ ভি এস যুক্ত স্যালাইন দ্রুত চালানো হবে, এক ঘন্টার কম সময়ে ১০টি এ ভি এস রোগীর রক্তে ঢোকা চাই।**

কোনরকম বাঁধন থাকলে এ ভি এস দেওয়ার সাথে সাথে তা খুলে দেবেন। পরবর্তী উন্নতি লক্ষ্য করে পরের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ধীর গতিতে স্যালাইন চলতে থাকবে ২৪ ঘন্টা। কালাচ কামড়ের ক্ষেত্রে ব্যথা ফোলা থাকবে না, চোখে পাতা পড়ে আসছে দেখলেই এ ভি এস দিতে হবে।

'চোখের পাতা পড়ে আসছে', এটি একটি অত্যন্ত জরুরি লক্ষণ। এই লক্ষণ দেখলেই একটি অ্যাট্রোপিন ইনজেকশন শিরায় (আই ভি) দিতে হবে, তারপর তিন সিসি (৩ মিলি) নিওস্টিগমিন ইনজেকশন দিতে হবে। ১ ঘন্টা পর দরকার হলে আবার দেওয়া যায়।

যা কখনই করবেন না

* কখনই 'মনসার থান' বা 'ওঝা/গুনিন' বা কোন 'ধর্মবাবা'-এর কাছে রোগীকে নিয়ে যাবেন না। বিষাক্ত সাপের কামড়ের একমাত্র চিকিৎসা অ্যান্টিভেনাম সেরাম (AVS) যা কেবলমাত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই পাওয়া সম্ভব।
* জোর করে রোগীকে বমি করাবেন না।
* ক্ষতস্থান থেকে বিষ টেনে আনার রীতি-নীতি অবান্তর—কখনই করবেন না।
* কামড়ানো স্থানে বরফ দেওয়া কিংবা অন্য কোন ঔষুধ লাগানোর কোন প্রয়োজন নেই—পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।
* কামড়ানো জায়গাটিতে কখনই কাটা বা চেরা করবেন না।

মন্তব্য : মনে রাখবেন ১ মিনিট সময় নষ্ট হওয়া মানে হল বৃক্কের ১ শতাংশ ক্ষতির সম্ভাবনা বেড়ে যাওয়া।

যা মনে রাখবেন

* প্রথমেই জায়গাটা ফুলে যাবে—ফোলা অংশটা ক্রমশ বাড়তে থাকবে— সাথে ব্যথাও হবে।
* আবার, কালাচের কামড়ে কোনও ব্যথা বা ফোলা খুব একটা হয় না।
* চোখের পাতা পড়ে আসবে এবং রোগী ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়বে।
* রোগী চোখে ঝাপসা দেখবে—কথা বলতে আড়ষ্ট লাগবে।
* গলার আওয়াজ ক্রমশ কমে আসবে।
* চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে নাক/কান/চোখ থেকে রক্ত ঝড়তে পারে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সাপের কামড় ও তার প্রতিকার—IHFW / Govt. of W.B.

E.mail.rajarouthbhbl@gmail.com • M : 9474417178

বাংলার যমুনা

লেখা ও ছবি : অনুপ হালদার

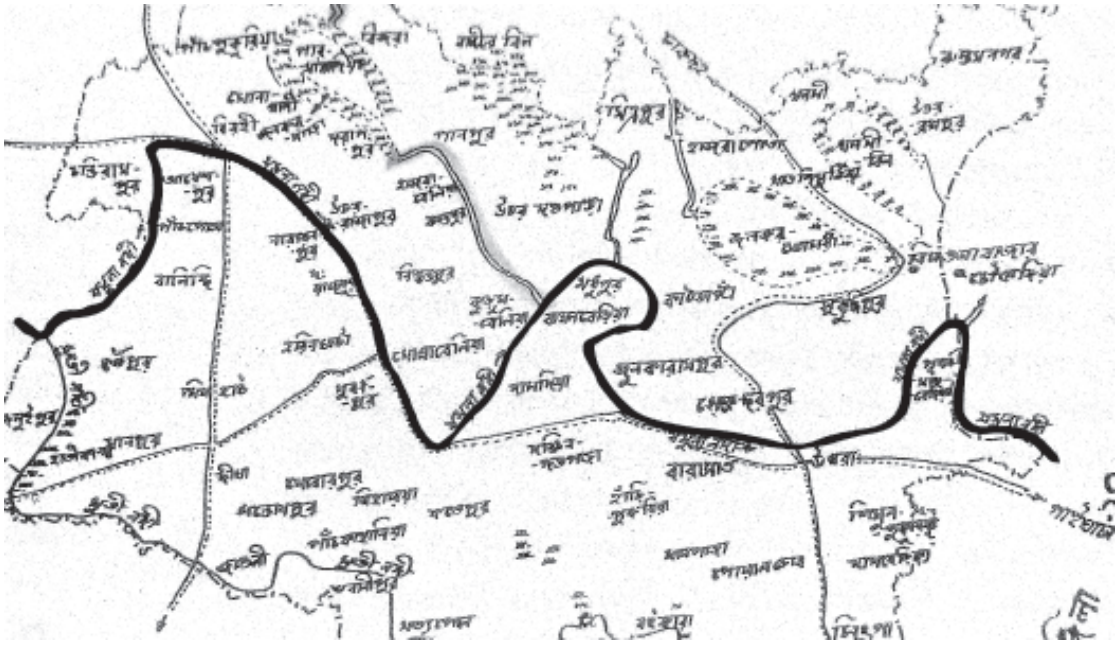

গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনার বদ্বীপ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বদ্বীপ। এর শিরা উপশিরায় প্রবাহিত নদী, আর এই নদীই জন্ম দিয়েছিল সভ্যতার। পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্যতারই এই ভাবেই সৃষ্টি। নদীর আতিথেয়তায় এইভাবে সভ্যতার বিস্তৃতির সাথে সাথে ক্রমশ দেখা দিতে লাগল স্থান সংকটের। সভ্যতার মালিকেরা দখল নিতে শুরু করল সৃষ্টির উৎসকে। এই দখলদারির আগ্রাসনে বিগত ১০০ বছরে প্রায় ৭০০ নদীর মৃত্যু হয়েছে। মৃত নদীগুলি ইতিহাসের পাতাতেও ঠাঁই পায়নি, ভূগোল তো অনেক দূর। এমনই একটি নদী-বাংলার যমুনা। ভাগীরথী হুগলী জেলার ত্রিবেনীতে এসে তিনটি ধারায় বিভক্ত হয়েছে যথাক্রমে পূর্ববেনী যমুনা, মধ্যবেনী ভাগীরথী এবং পশ্চিমবেনী সরস্বতী। উত্তর ভারতের কৃষ্ণলীলার সঙ্গে সম্পর্কিত যমুনার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তবে কৃষ্ণযোগ যে একেবারেই নেই তা বলা যাবেনা। বৈষ্ণব চিন্তাধারায় নিমাই হল নবরূপে শ্রীকৃষ্ণ। তাই অনেকে মনে করেন নদীয়াতে নিমাইও ছিল, ছিল যমুনাও।

যমুনা নদীয়ার চাকদহের প্রদ্যুম্ন সরোবর থেকে উৎপত্তি লাভ করে প্রায় ১০০ কিমিঃ পথ অতিক্রম করে উত্তর ২৪ পরগনার চারঘাটে গিয়ে ইছামতীর সাথে মিলিত হয়েছে। পরবর্তী কালে ভাগীরথীর গতিপথ পরিবর্তনের সাথে সাথে যমুনাও তার উৎস মুখ পরিবর্তন করে ক্রমশ দক্ষিণ দিকে সরে যায়। তাই উৎসমুখ কখনও কালীগঞ্জ, কখনও মদনপুরের বয়সার বিল, কখনও আবার বাগের খাল। যাই হোক না কেন এই উৎসমুখের সাথে যমুনার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে কয়েক শতক পূর্বে। উৎসমুখে গড়ে উঠেছে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল। (প্রসঙ্গত এই রাজ্যের প্রথম এমস্ হসপিটালটিও এই যমুনার পাড়েই গড়ে উঠছে)। এক কথায় আধুনিক সভ্যতার কারণে উৎসমুখে যমুনাকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। প্রকৃত উৎসের ২০/২৫ কিমি দূর থেকে যমুনার ক্ষীণ জলরাশি পরিষ্কার ভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা সীমান্তে মৃত যমুনা খাতে রয়েছে বয়সার বিল, কুলিয়া বিল,

এম্‌স-এর পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে যমুনা

মথুরা বিল, যারা এখন প্রাণপণে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই করছে। বয়সার বিল আয়তনে প্রায় ৫৫/৬০ হেক্টর হলেও বর্তমানে বর্ষার জল ছাড়া সারাবছর জলই থাকেনা বললেই চলে। বর্ষার মাসকয়েক বাদ দিয়ে পুরোদস্তুর চলে চাষাবাদ। ফলে চাষের খাস জমি ব্যক্তিগত নামে রেকর্ড

বয়সার বিল

হয়ে জমির চরিত্র বদল হয়ে যাছে ক্রমে ক্রমে। বিলের পারের বসতি প্রতিদিনই একটু একটু করে বিলের দিকে নেমে আসছে। এরপরেই যমুনা গতিপথের দ্বিতীয় বিলটি হল কুলিয়া বিল। প্রায় ৪০ একর এই বিলে সমবায়ের মাধ্যমে মৎস্য চাষের পাশাপাশি রয়েছে পঃবঃ সরকারের মৎস্য গবেষণাগার যা পঃবঃ মৎস্য গবেষণার আঁতুরঘর বলা যায়। কিন্তু গয়েশপুর শিল্পতালুকের দূষিত বর্জ্য প্রতিদিন পরিশোধন না করে ফেলা হচ্ছে বিলে। ফলে বিলের বাস্তুতন্ত্র একেবারে ভেঙে পড়েছে। প্রতি শীতে এই বিলে প্রায় ২০০০/২৫০০ পরিযায়ী পাখি আনাগোনা করত। আজ তারাও একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। যমুনা গতিপথের তৃতীয় বিলটি হল মথুরা বিল। আয়তনে প্রায় ১৯০ হেক্টর জমিতে গড়ে ওঠা এই বিলের সাথে বাগের খালের মাধ্যমে গঙ্গার

কুলিয়ার বিলে পরিযায়ী পাখি

কুলিয়ার জল দূষণ

সংযোগ ছিল এক সময়ে।

জোয়ার ভাঁটা খেলত বিলের জলে। কিন্তু বর্তমানে কাঁচরাপাড়া হালিশহর এবং আংশিক কল্যাণীর পৌরবর্জ্য বাগের খালেরমাধ্যমে প্রতিদিন গঙ্গায় মিশছে এবং মথুরা বিলের সাথে বাগের খালের সংযোগও আজ বিচ্ছিন্ন। ফলে বিলে জলস্তর ব্যাপক ভাবে কমেছে। মথুরা বিলের পাড়েই গড়ে ওঠা নদী গবেষণাগারের গবেষণাতেও প্রভাব পড়েছে ব্যাপক ভাবে। এবং K.M.D.A ও পঃবঃ সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা জল প্রকল্পও (মথুরা বিলের জল পরিশোধন করে ওই এলাকার পঞ্চায়েতগুলিতে পৌঁছে দেওয়া) বন্ধ হয়ে গেছে। এরপর থেকেই যমুনাকে ক্ষীণ অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায় সরল রেখায়। যমুনা হরিনঘাটা অতিক্রম করে চৈবেড়িয়া, নগরউখড়া, গাইঘাটা, মছলন্দপুর, গোবরডাঙ্গা, ইছাপুর, মল্লিকপুর অতিক্রম করে, স্বরূপ নগর থানার চারঘাটের কাছে ইছামতীতে মিলিত হয়েছে। ৬০০ বর্গমাইল জলধারণ করার ক্ষমতা ছিল

বাগের খাল ও গঙ্গার সংযোগ

এই নদীর। অথচ আজ কচুরী পানায় পরিপূর্ণ, মাছ ধরার ভেসাল, বাড়ির পৌরসভার জঞ্জাল, শ্মশান এর ছাই ও বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতির যন্ত্রণায় আজ মৃত্যুর অপেক্ষায় সে দিন গুনছে।

অথচ এই পথেই টোডোর মল এসেছিলেন ইছাপুরের জমিদার বাড়ি। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও ইংরেজ বড়লাটদের গোবড়ডাঙ্গাতে পদার্পণ ঘটেছে এই নদীপথে। গোবরডাঙ্গার খাঁটুরার বাণিজ্য সমৃদ্ধির যুগে বাণিজ্য তরীগুলি চিনি, ঘি, লবণ, নীল, তামাক গোবরডাঙ্গা বন্দর থেকে হুগলী, ব্যান্ডেল, কলকাতা পর্যন্ত যাতায়াত করত। ইছাপুরের জমিদার এবং জলেশ্বর চৈবেড়িয়ায় রাজাদের বাণিজ্য এবং সুদক্ষ নৌসেনা, নৌবহর উত্তাল যমুনার প্রবাহ পথ ধরেই চলত গোবরডাঙ্গা বসিরহাট হয়ে টাকি হাসনাবাদ পর্যন্ত। ব্রিটিশ আমলে লঞ্চ সার্ভিসও চালু ছিল। টাকির জমিদারের ২৪ দাঁড়ের দ্রুতগামী নৌকা মাত্র ৪ ঘণ্টায় টাকি থেকে বরানগর পৌঁছাত। দীনবন্ধু মিত্র, অমৃতলাল বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ মনীষিরাও এই নদীপথেই যাতায়াত করতেন। এই নদী তীরেই জন্মগ্রহণ করেছেন গৈপুরের ভারত খ্যাত ভুতাত্বিক প্রমথ নাথ বসু, সুবর্ণপুরের ডাক্তার মহেন্দ্র ব্যানার্জী (আর জিকরের প্রতিষ্ঠাতা), বাঁশের কেল্লা খ্যাত তিতুমীর, খাঁটুরার প্রথম বিধবা বিবাহ খ্যাত শীশচন্দ্র, ভারত খ্যাত শিকারি জ্ঞানদা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ গুণীজন।

যমুনার মৃত্যুর সাথে সাথে যমুনা অববাহিকায় থাকা গ্রাম বা জনপদগুলি আজ আর্সেনিকের করাল গ্রাসের মুখে। হরিণঘাটা থেকে টিপি পর্যন্ত প্রায় ৭০ কিমিঃ নদী অববাহিকায় সবকটি গ্রামই কমবেশি আর্সেনিক প্রবণ। তবে হরিণঘাটার মোল্লাবেলিয়া, নোনাঘাটা, গাইঘাটা থানার রামপুর, নগরউখড়াতে আর্সেনিক এর সমস্যা প্রবল। যমুনার প্রায় ২০০ বর্গমাইল অববাহিকায় অন্তত ৪ লক্ষ বিঘা কৃষিজমি রয়েছে যা প্রতি বছর বন্যা ও খরায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শুধুমাত্র হরিণঘাটা ব্লকের প্রায় ২০০০/২৫০০ মৎস্যজীবী। যমুনার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল এদের জীবন জীবীকা আজ হারাতে বসেছে। নদীর

আর্সেনিকের লক্ষণ

মৃত্যুর সাথে সাথে ভেঙে পড়েছে পরিবেশের বাস্তুতন্ত্র। মুখ ফিরিয়েছে পরিযায়ী তথা বাংলার জলজ পাখিরা। হারিয়ে যাচ্ছে বাংলার পরিচিত মাছ। যমুনা আজ নদীয়া ও ২৪ পরগনার একটি আঞ্চলিক ড্রেন। যমুনার মৃত্যুর সাথে সাথে কমপক্ষে ১২টি শাখানদী ও ৫০টি বড় বিল বা জলাশয়, একশর মত খালেরও অপমৃত্যু ঘটেছে। ব্রিটিশ আমলে নদী

পরিবহনের তথা নৌবাণিজ্য সহজ, সুলভ বলে বিবেচিত হত। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ, দক্ষিণবঙ্গের নীলবিদ্রোহ ও তিতুমীরের বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার রেল ও সড়ক পথ সম্প্রসারণের প্রয়োজন অনুভব করেন এবং যমুনার ওপর ২টি রেল সেতু ও চারটি সড়ক সেতু তৈরি হয়। বর্তমানে ১২টি সেতু ও অগুণতি সড়ক পথ যমুনার যাত্রা পথকে রুদ্ধ করেছে। এর সাথে নদীপার দখল, চাষের জমি সম্প্রসারণ যমুনার যাত্রাপথকে অবরুদ্ধ করেছে।

১৯১৮ সালে গোবড়ডাঙ্গার জমিদার গিরিজা প্রসন্নের নেতৃত্বে যে যমুনা সংস্কার আন্দোলন হয় তার ফলে ব্রিটিশ সরকার সেনেটারী ড্রেনেজ অ্যাক্ট অনুসারে এটির সংস্কার করেন। পরবর্তী কালে ১৯৫২ সালে কাঁচরাপাড়া পৌরসভার উদ্যেগে এটির সংস্কারের চেষ্টা করা হয়, এবং ১৯৫৫ সালে অজয় মুখার্জী সেচমন্ত্রী থাকাকালীন এটির প্রতিকী সংস্কার হয়েছিল। কিন্তু এর পর আর কোনোভাবেই এর ওপর নজর দেওয়া হয়নি। অবিলম্বে মৃত যমুনার সংস্কার এবং নদীর প্রয়োজনীয়তা নতুন প্রজন্ম ও অববাহিকার মানুষের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন। মৃত নদীর সীমানা নির্ধারণ করাও আবশ্যিক যাতে মৃত নদীও যেন চুরি না হয়ে যায়। নদীকে কাজে লাগিয়ে মৎস্য চাষ, ব্যবসার পাশাপাশি এই জেলার আর্সেনিকেরও মোকাবিলা করা সম্ভব। এতে কর্মসংস্থানেরও নতুন দিশা দেখা যেতে পারে।

২০০০ সালের বন্যায় নদী তীরস্থ যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ প্লাবিত হয়েছিল আসলে সেই অংশটিই ছিল যমুনার মূলগতিপথ, বর্তমানে তার এক তৃতীয়াংশও বেঁচে নেই। ১৮৪৬ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত নদীয়া ও ২৪ পরগণায় যে ব্যাপক মহামারীতে (কলেরা) হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয় এবং গ্রামগুলি জনশূন্য হয়ে পড়ে তার কারণ **'নদীয়া ফিভার'**। যমুনার অপমৃত্যুই এর প্রধান কারণ। আমরা আবার সেই পথেই হাঁটছি না তো? নদীর অবলুপ্তি যদি সভ্যতার অবলুপ্তি হয় তবে কি আমরাও কি ধরে নিতে পারি যে আমাদেরও অবলুপ্তি আসন্ন।

E.mail.anuphalderkly@gmail.com • M : 9143264159

প্রচ্ছদ কথা

সম্রাট সরকার

সেই রবি ঠাকুরের 'সহজ পাঠ' থেকে শুরু করে হালফিলের ল্যাপটপের ওয়াল পেপার, বিখ্যাত বার্ড ফটোগ্রাফার বেন্স মাতে-র পুরস্কার জয়ী ছবি থেকে শুরু করে পক্ষীবিদদের দিস্তে দিস্তে সমীক্ষাপত্র, বকের মাছ খাওয়া যেন ফুরতেই চায়না। অতিসাধারণ বললেও কম বলা হবে, এ এমনই এক ঘটনা। অধুনা মোবাইলবিলাসী মাথানত কূপমন্ডূকও অন্তত প্রকৃতির মাঝে না দেখুক ইন্টারনেটে দেখে ফেলবেই এই অতিসাধারণ দৃশ্য। বক মাছ ধরে, খায়। হ্যাঁ খায়! তো!

আমরা যখন পাখির ছবি তোলা শুরু করি তখন তৎকালীন গুরুদেবরা বলতেন ''শুধু বকের ছবি তুলে ঘোড়ার ডিম হবে। বকের মাছ খাওয়ার ছবি তোল।'' তো খাল-বিলে বক দেখলেই হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতাম। বক একটা মাছ ধরবে আর আমার একটা ক্লিক। সে মারাত্মক ঝকমারি। বললেই হল? বক নিদেনপক্ষে দশবার জলে ঠোক্কর মারে তো একবার মাছ পায়। হয় তখন আমার ফোকাস বাইরে নয়তো বকের মুখ আড়ালে। এই করতে করতে বকের মাছ খাওয়ার ছবি তোলা আমার চ্যালেঞ্জের পর্যায়ে চলে গেল। ছবি তোলার বাইরে আমার জেদ চেপে গেল কিভাবে বক মাছ ধরে, খায় তার খুঁটিনাটি জানতে হবে। তবেই সাফল্যের হার বাড়বে। এক অতিসাধারণ ঘটনা। তবু কত বিশদে বিজ্ঞানীরা পর্য্যবেক্ষণ করেছেন। কিছু জেনেছি। কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। চমৎকৃত হয়েছি। আর হ্যাঁ, অসাফল্য কমেছে। প্রচ্ছদের ছবিগুলো সেই বিস্তর দৌড়ঝাঁপের ফল।

ছবি না হয় হল। আমি হাততালি পেলাম। আমার পেটের মাছ-ভাত ছবি তুলে হয় না। কিন্তু বকের পেট ওই মাছ খেয়েই চলে। ওদের ''পেট কা সাওয়াল''। তাই একটু সিরিয়াস হই।

আমজনতা যে কোনো লম্বা ঠ্যাং, লম্বা সরু গলাওয়ালা জলের পাখি মানেই বক হিসেবে চেনে। আসলে ছবির পাখিটি 'লাল কাঁক' বা বিলিতি ভাষায় Purple Heron।

লাল কাঁক অনেক কৌশল অবলম্বন করে মাছ ধরার জন্য। এখানে যে কৌশলটি দেখা যাচ্ছে সেটা স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে কখন মাছটি নাগালের মধ্যে আসবে তার জন্য অপেক্ষা করা। তারপরের ঘটনাক্রম অনেকটা এরকম হতে পারে—

১। S আকৃতি করে গলাটাকে লম্বা করে নেয়। মাথা নামিয়ে আনে মাছটির কাছাকাছি। দেহ একেবারে স্থির হয়ে থাকে। গলা এবং দেহের সংযোগস্থলে বিশেষভাবে লম্বা ষষ্ঠ সার্ভিকাল ভার্টিব্রা ঠোক্কর দেওয়ার সময় কব্জার কাজ করে। পা দুটি ভাঁজ করে রাখে।

২। সাধারণত একটু কোনাকুনি মাছটার ওপর বিদ্যুৎগতিতে আঘাত করে। কোনাকুনি আঘাত করার ফলে জলের নীচে মাছের প্রতিসরণ-জনিত ভ্রম এড়ানো যায় এবং বুঝতে সুবিধা হয় মাছটি জলতলের ঠিক কতটা নীচে আছে।

৩। ঠোক্কর মারার সময় ঠোঁট দুটি সামান্য ফাঁক অবস্থায় থাকে। বড়সড় মাছের ক্ষেত্রে চেষ্টা করে ধারালো ঠোঁটে গেঁথে ফেলতে। ছোট মাছ হলে দু-ঠোঁটের মাঝে চেপে ধরতে চায়। কিন্তু এখানে তুখোর ব্যতিক্রম। ছোট্ট পুঁটিমাছ কে উপরের ঠোঁটে গেঁথে ফেলেছে। বোঝা যাচ্ছে আঘাতটি সম্পূর্ণ লক্ষ্যে ছিল। ঠোক্কর মারার সময় চেষ্টা করে মাছটির মাথার কাছাকাছি আঘাত করতে। যাতে দ্রুত মৃত্যু সুনিশ্চিত হয়।

৪। লাল কাঁক মাছ ধরার পর মাছটিকে কোন ফাঁকা জায়গায় নিয়ে আসে। যেমন ছবিতে দেখা যাচ্ছে। যাতে ঠোঁট থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ফেলার সময় ফস্কে গিয়ে জলা-ঘাসের মধ্যে হারিয়ে না ফেলে। সবসময় মাছটিকে মাথার দিক দিয়ে গিলে ফেলে।

এতো গেলো একটি কৌশল। আরো অনেক কৌশল আছে লাল কাঁকের। মাছ ধরার জন্য। সেগুলি আলোচনার জায়গা এটা নয়। তবু গড়পরতা চিত্রগ্রাহক হিসেবে বকের মাছ ধরার ছবি তুলতে তুলতে এক স্বভাব-লাজুক পাখির চমৎকার স্বভাব-বৈচিত্র চাক্ষুস করা, এ কখনো ভেবেছিলাম!

E.mail.samratswagata11@gmail.com • M : 9433962227

প্রসঙ্গ জৈবঘড়ি এবং নোবেল বিজেতা

জগন্ময় মজুমদার

জেফ্রি সি হল

মাইকেল রসবাশ

মাইকেল ডব্লু ইয়ং

পৃথিবীর যে-কোনও জৈবসত্ত্বা, আমাদের এই গ্রহের অবিরত ঘূর্ণনের সঙ্গে আবহমান কাল ধরে সম্পৃক্ত, অভিযোজিত হয়ে আছে। দীর্ঘকাল ধরে আমরা জেনে এসেছি পৃথিবীর যেকোনো প্রাণ, অ্যামিবা থেকে ম্যামথ এবং অবশ্যই মানুষ— প্রত্যেকের বুক পকেটের নীচে আছে এক অন্তর্গত অদৃশ্য আহ্নিক গতি সম্পৃক্ত (সারকাডিয়ান রিদ্‌ম) জৈব ঘড়ি যার নিঃশব্দ তর্জনী হেলনে আমরা আগেভাগেই বুঝে নিতে পারি দিন ও রাতের নিয়মিত ছন্দস্পন্দন। কিন্তু কীভাবে কাজ করে এই জৈব ঘড়ি? জৈবঘড়ির এই গোপন গহন কাজের ধরন-ধারণ, ভঙ্গি ও দিশা আবিষ্কারের সূত্রে এবার চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন আমেরিকার বিজ্ঞানীত্রয়ী— জেফ্রি সি হল (১৯৪৫), মাইকেল রসবাশ (১৯৪৪) এবং মাইকেল ডব্লু ইয়ং (১৯৪৫)।

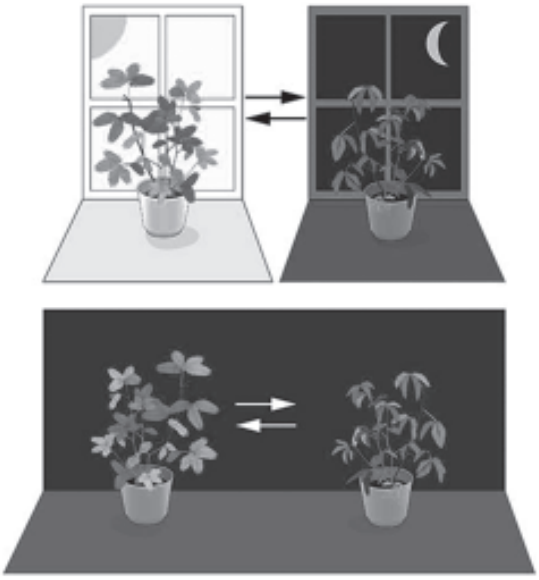

একটি আভ্যন্তরীণ জৈব ঘড়ি। দিনের বেলায় মিনোসা উদ্ভিদের পাতা খুলে যায় এবং রাতে বন্ধ হয়। জিয়েন মেহরান দেখান, গাছটিকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখলেও দৈনন্দিন ছন্দে পাতা খোলা ও বন্ধ চলতে থাকে।

এই জৈব ঘড়ি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ওঁরা আদর্শ প্রাণী হিসেবে বেছে নিয়েছেন এক ফলের মাছিকে। এবং দীর্ঘ গবেষণায় অবশেষে বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছেন এমন একটি বিশেষ জিন যা আমাদের প্রাত্যহিক যাবতীয় জৈব কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রক এবং এই পৃথিবী নামক গ্রহের ছন্দবদ্ধ ঘূর্ণনের সঙ্গেও ওতপ্রোত। ফলত আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ ওই জৈবঘড়ির নজরবন্দী— আমাদের আহার নিদ্রা মৈথুন, সূর্যমুখীর আলোর দিকে যাওয়া, বকফুল, কলকাসুন্দা পাতার সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে পড়া কিংবা রজনীগন্ধার সান্ধ্যসুরভি ছড়ানো। ওই সারকাডিয়ান রিদম বা আহ্নিক গতি সম্পৃক্ত জীবনের ঘড়ি ছোট্ট এককোষি বাদামি শৈবাল গোনিউলাক্স পলিযেড্রাকে যেমন বলে দেয় নিশাকালে জোনাকির মতো জ্বলে উঠতে তেমন বলে দেয় মা-ইঁদুরকে আটাশ দিন গর্ভধারনের পর দিনের বেলা ছানা প্রসব করতে। লক্ষণীয় দিনের বেলা, রাতের বেলা নয়, কেননা রাতে তো মা-ইঁদুরকে খাবারের সন্ধানে বেরুতে হবে। অথবা সিন্ধুঘোটকের বাবা যেমন একদম মায়ের স্নেহে সদ্যপ্রসূত সিন্ধু অশ্বের দেখভাল করে। মাঘশেষে বোল আসে আমের, উড়ে আসে মৌমাছি, পিঁপড়েরা বৃষ্টির গন্ধ পায়, কাঠবেড়ালি টের পায় ভূমিকম্পের পূর্বাভাস।

আমাদের আচার আচরণ, হরমোনের ক্রিয়াকুশলতা, ঘুম, দেহতাপ, যৌনতা তথা জীবনের সমস্ত রকম শরীরবৃত্তীয় কাজকেই নিয়ন্ত্রণ করে এই জৈবঘড়ি। আবার কখনো তা বিগড়েও যায় যখন বাইরের হঠাৎ ভিন্নধর্মী আবহাওয়া, কোনো ভৌগলিক পরিবেশ, বিশেষ করে বিমান ভ্রমণকালীন বিভিন্ন Time Zone অতিক্রমণের সময় জেট ল্যাগের অভিজ্ঞতায় যা বেশ ধরা পড়ে। কোথায় যেন কি একটা উল্টে পাল্টে গেছে। ক্যানসার, অ্যালঝাইমার্স, ইনসমোনিয়া, ডিমেনশিয়া থেকে ডিপ্রেসনের জন্যও দায়ী এই জৈবঘড়ির ধীর এবং দ্রুত চলন।

জৈবঘড়ি নিয়ে অনেকদিন ধরেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। এ ব্যাপারে বিশেষ করে জাপানি বিজ্ঞানীদের অবদান দৃষ্টান্তমূলক এবং অনস্বীকার্য। এর কার্যকারিতা নিয়ে গবেষণার সাফল্যের মুকুটে সংযোজিত হল এবার জেফ্রি সি হল ও তাঁর সহ গবেষকদের

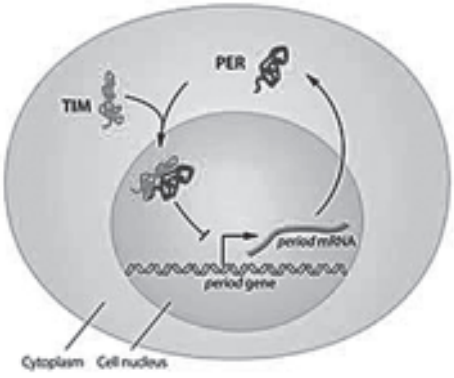

জৈব ঘড়ির পারমানবিক উপাদানগুলির একটি সরল চিত্র।

আবিষ্কার। তাঁদের আবিষ্কৃত ফলের মাছি থেকে প্রাপ্ত একটি পিরিওডিক জিন বা Per Gene, অবশেষে সৃষ্টি করল যুগান্ত, ছিনিয়ে আনল নোবেল পুরস্কার।

এই জিনটি আসলে একটি প্রোটিন বা ট্রান্সক্রিপশান ফ্যাক্টর। এই ফ্যাক্টরটির মাধ্যমে কোনো জীবের প্রকৃত জৈবঘড়ির ক্রিয়াকাণ্ডে বাধা সৃষ্টি সম্ভব। Per Gene সৃষ্ট মেসেঞ্জার RNA বা mRNA জৈবঘড়ির ব্যাটারি বা প্রোটিনকে চালিত করে। 'Per-এর পর দ্বিতীয় আরও একটি ক্লকজিনের উদ্ভাবন হল, নাম দেওয়া হল Tim (Timeless থেকে)। জানা গেল Per আর Tim-র যুগলবন্দিই জৈবঘড়ির ছান্দিক স্বপ্নিল টিকটিকের কারণ।' (মৃন্ময় চন্দ, ১৩ অক্টোবর, ২০১৭, এই সময়)

সংক্ষিপ্ত পরিচিত হিসেবে প্রসঙ্গ জানাই : জেফ্রি সি হল আমেরিকার নিউ ইয়র্কে জন্মগ্রহণ করেন (১৯৪৫)। ক্যালিফোর্নিয়ার ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির প্যাসাডোনার পোস্ট ডক্টরাল ফেলো। আমেরিকার ব্রান্ডিস বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অ্যাসোসিয়েড অধ্যাপক।

মাইকেল রসবাশ (১৯৪৪) আমেরিকার কানসাসে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭০-এ ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন। পোস্টডক্টরেট ফেলো হন স্কটল্যান্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের। ১৯৭৪ থেকে ব্রান্ডিস বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাওয়ার্ড হিউজেস মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট-এ গবেষণারত।

মাইকেল, ডব্লু ইয়ং (১৯৪৯) মিয়ামিতে জন্মগ্রহণ করেন। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট (১৯৭৫), স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট ডক্টরেট ফেলো (১৯৭৫-৭৭)। ১৯৭৮ থেকে রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন।

M : 9432523890

জীবজ রসায়নের সীমারেখা

তপন দাস

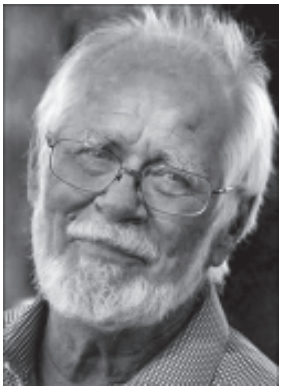

জ্যাক্স ডবুচেট

জোয়াকিম ফ্রাঙ্ক

রিচার্ড হেন্ডারসন

মানব জাতির জন্যই প্রযুক্তি। তা সে কৃষিই হোক অথবা রসায়নের ক্ষেত্র। এই প্রযুক্তিই সারা বিশ্বকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। একথা ঠিক যে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যও প্রযুক্তির ব্যবহার অনস্বীকার্য। ২০১৭ সালের রসায়নের নোবেল জয়ীরা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েই জীবজ রসায়নের আকাশে এক নতুন সীমারেখা অঙ্কন করেছেন। চলতি বছরে রসায়নের তিন নোবেল জয়ী জ্যাক্স ডবুচেট, জোয়াকিম ফ্রাঙ্ক এবং রিচার্ড হেন্ডারসন ক্রায়ো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের যে উন্নতি ঘটিয়েছেন তাকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা একটি জীবন্ত কোষের ত্রিমাত্রিক গঠন স্পষ্ট ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। তাই এই প্রযুক্তি জীবজ রসায়নে এক নতুন যুগের সূচনা করবে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রোটিন, DNA, RNA-র মতো জৈব অনুদের জৈব রসায়নে ভূমিকা সম্পর্কে জানা থাকলেও এদের গঠন সম্পর্কে সেরকম কোনো ধারণা ছিল না। কেমব্রিজের ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবোরেটরির একদল গবেষক প্রথম এক্স-রে কৃষ্টালোগ্রাফির সাহায্যে এই ধরনের অনুগুলোর গঠন সম্পর্কে ধারণা দেন। আশির দশকের দিকে এক্স-রে কৃষ্টালোগ্রাফির সঙ্গে যুক্ত হয় NMR স্পেকট্রোস্কোপি, যার মাধ্যমে কঠিন এবং দ্রবনে অনুগুলোর গঠন কিরকম তা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এই দুই পদ্ধতির হাত ধরে বিজ্ঞান অনেকটা এগুলেও কিছু ত্রুটি ছিলই। যেমন একদিকে NMR শুধুমাত্র ছোটো অনুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা গেলেও অপেক্ষাকৃত বড় অনুর ক্ষেত্রে কার্যকরি হচ্ছিল না। আবার অন্যদিকে এক্স-রে কৃষ্টালোগ্রাফি খুব

ভালো বিশুদ্ধ কেলাসের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যাচ্ছিল। কিন্তু যেখানে কেলাস গঠিত হয় না তাদের ক্ষেত্রে কি হবে? তাই নতুন কিছুর দিকে সবাই তাকিয়ে ছিল।

জীব বিজ্ঞানী ও রসায়নবিদরা কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছিলেন ১৯৮৬ সালের পদার্থবিদ্যায় নোবেল জয়ী রুসকার ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। ২০১৭ রসায়নের নোবেল জয়ীর একজন রিচার্ড হেন্ডারসন যিনি বর্তমানে কেম্ব্রিজের মলিকিউলার বায়োলজি বিভাগের একজন বিজ্ঞানী, কৃষ্টালোগ্রাফি ব্যবহার করে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করলেও পরবর্তীকালে অনেক সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে তিনি ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্য নিয়েছিলেন। ব্যাকটেরিওরোডেপসিন নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে অনেক বার তিনি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে সব ছেড়ে ফেলে আসার লোক তো তিনি নন! তিনি খুঁজতে থাকেন সবচেয়ে ভালো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ। ১৯৩০ সালে প্রথম ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার হলেও ততদিনে এটা অনেক উন্নত হয়ে গিয়েছে। অবশেষে প্রায় ১৫ বছর আগে ব্যাকটেরিওরোডোপসিনের গঠন পারমানবিক স্বচ্ছতায় দেখতে সক্ষম হয়েছেন। তারপর থেকে প্রতিদিনই তার কাজের একটি অংশ হল কীভাবে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের আরো উন্নতি ঘটানো যায়। অবশেষে ২০১৩ সালে তিনি তার লক্ষ্যে পৌঁছে যান। তার আবিষ্কৃত নতুন পদ্ধতি ক্রায়ো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি। তিনি দেখিয়েছেন অনিয়তাকার কেলাসের গঠন কীরূপ সেটাও ক্রায়ো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব হয়। যে পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি তার লক্ষ্যে পৌঁছেছেন, সেই পথ ধরে আজ অনেকেই অনেক নতুন দিশা দেখাতে সক্ষম হবে একথা অনস্বীকার্য।

২০১৭ রসায়নের নোবেল জয়ীর অপর ব্যক্তি কলম্বিয়ার অধ্যাপক জোয়াকিম ফ্রাঙ্ক ক্রায়ো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে প্রাপ্ত কোনো জীবজ অনুর দ্বিমাত্রিক গঠনের চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ত্রিমাত্রিক গঠনের ব্যাখ্যা করে যে নতুন নজির সৃষ্টি করেছেন তা বিজ্ঞানের পরিধিকে আরো সুস্পষ্ট করতে সহায়তা করবে। এক সঙ্গে জমাট বেঁধে থাকা অনুগুলোর থেকে একটি একক অনুকে যখন স্পষ্ট ভাবে দেখা সম্ভব হচ্ছিল না তখন অধ্যাপক জোয়াকিম ফ্রাঙ্কের বিশ্লেষিত পদ্ধতি অনেক সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়। অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক সমস্ত কাজগুলিকে এক সাথে করার জন্য যে কম্পিউটার প্রোগ্রামের উদ্ভাবন করেছেন তার নাম স্পাইডার। মনে করা হয় এই পদ্ধতি জীবজ-পদার্থ বিজ্ঞানীদের গবেষণার পথকে আরও অনেক মসৃণ করে তুলবে।

সুইজারল্যান্ডের লসানি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্যাকস ডবুচেট, ২০১৭ সালে রসায়নের নোবেল-শিরোপা যার মাথায় উঠেছে তিনি ক্রায়ো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে যে দ্রবণ ব্যবহার করা হয় তা কীভাবে আরো স্পষ্ট প্রতিবিম্ব দিতে পারে তার চেষ্টা করেছেন এবং সফলতা লাভ করেছেন। ১৯৮০ সালের আগে পর্যন্ত জীবজ অনুকে নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে শীতল অবস্থায় নিয়ে আসাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু এতে জল জমে যে বরফের কেলাস তৈরি হতো তা অনেক ক্ষেত্রেই স্পষ্ট প্রতিবিম্ব তৈরিতে বাধা হয়ে দাঁড়াত। ডবুচেট তরল নাইট্রোজেনের উপস্থিতিতে একটি কার্বন আস্তরনের গ্রিড তৈরি করে তার উপর জল ছড়িয়ে দিয়ে দ্রুত ঠান্ডা করার জন্য তরল ইথেনের মধ্যে রেখে দিতেন। এই ভাবে উৎপন্ন দ্রবণ ক্রায়ো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে ব্যবহারে সবচেয়ে বেশি উপযোগী তা ১৯৮৪ সালেই বিজ্ঞানী মহল স্বীকার করে নিয়েছিল।

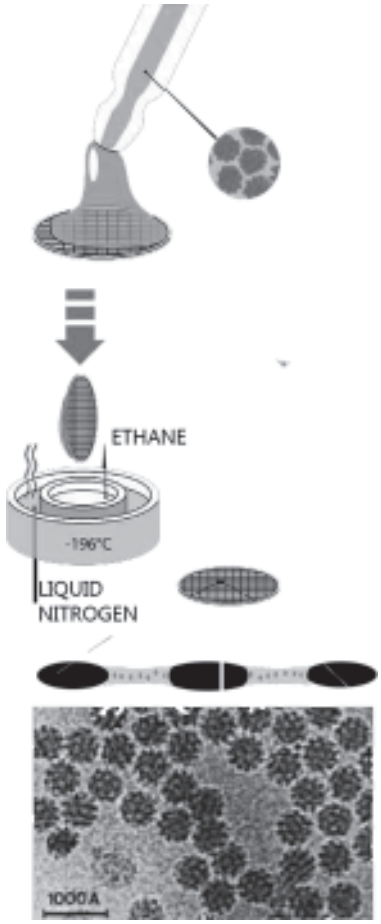

ক্রায়ো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপির জন্য নমুনা প্রস্তুতি

এই তিন বিজ্ঞানীর পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে গবেষকরা ক্রায়ো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে ক্যানসার ড্রাগকে টার্গেট করতে এমনকি জিকা ভাইরাসকে সনাক্ত করতেও সক্ষম হয়েছে। এই তিন বিজ্ঞানীর পরিশ্রমের সার্থকতা এখানেই যে তাদের কাজের মাধ্যমে ফার্মাসিউটিকলসের উন্নয়ন ঘটিয়ে মানুষের জীবনের রসায়নকে অনেকাংশে বদলে দেবে এটা আশা করাই যায়। তাই হয়তো সুইডিস একাডেমির সদস্যরা এবছরে রসায়নে নোবেলের শিরোপা এই তিন বিজ্ঞানীর মাথায় তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

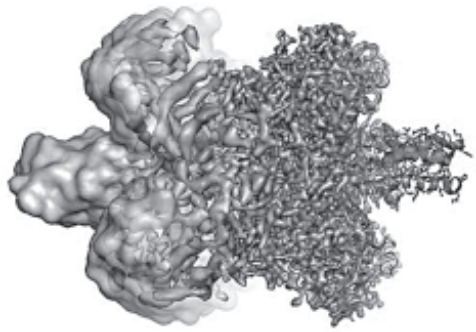
উন্নত ক্রায়ো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে একটি প্রোটিনের নিখুঁত ছবি

E.mail.tdcob25@gmail.com • M : 9434686749

পদার্থবিদ্যায় নোবেল : ২০১৭

রতন দেবনাথ

রাইনার ওয়েইস

কিপ থর্ন

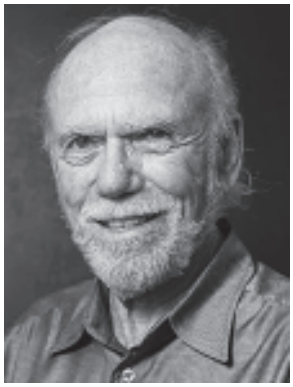

বারিশ বারি

এক যুগান্তকারী পর্যবেক্ষনের স্বীকৃতি হিসাবে ২০১৭ সালের পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেলেন তিনজন বিজ্ঞানী। এঁরা হলেন ওয়েইস রাইনার, বারিশ বারি এবং থর্ন কিপ। মহাকর্ষীয় তরঙ্গের অস্তিত্ব যন্ত্রে ধরেই তাঁদের এই পুরস্কার। যে আবিষ্কারের রেশ খুলে দেবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের এক নবদিগন্ত।

মহাকর্ষীয় তরঙ্গের ধারনা প্রথম দিয়েছিলেন বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন। আজ থেকে এক'শ বছর আগে আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের ভিত্তিতে গাণিতিক ভাবে দেখিয়েছিলেন যে, বস্তুর ভরের ত্বরণে সৃষ্টি হয় মহাকর্ষীয় তরঙ্গ। আলোড়িত হয় তার

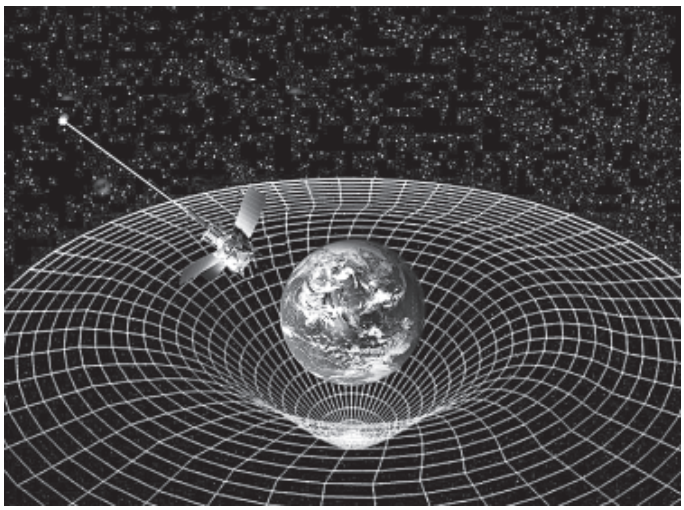

মহাকশীয় তরঙ্গ

চারপাশ। তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। এগিয়ে চলে শূণ্যস্থানের মধ্যে দিয়ে। আলোর গতিতে। শূন্যস্থানকে কাঁপিয়ে। এরকমটি হতে পারে ছোট বড় সব বস্তুর ক্ষেত্রেই। তবে ছোট ছোট বস্তুর ক্ষেত্রে তরঙ্গ এতটাই দুর্বল যে তার অস্তিত্ব টের পাওয়া দুঃসাধ্য। বিশালাকার মহাজাগতিক বস্তুর ক্ষেত্রে তার শক্তি অনেক বেশি। যেমন, অনেক অনেক দূরে সংঘর্ষে লিপ্ত দুটি ব্ল্যাকহোল-এর থেকে সৃষ্ট মহাকর্ষীয় তরঙ্গের শক্তি ঘটনাস্থলে অনেকটাই বেশি। তবে অতদূর থেকে পৃথিবীতে পৌঁছালে তা হয়ে পড়ে অনেকটাই দুর্বল। চলে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। মহাকর্ষীয় তরঙ্গের গাণিতিক অস্তিত্বের কথা আইনস্টাইন বললেও তিনি নিজেই সন্দিহান ছিলেন যে, আদৌ তার অস্তিত্ব বাস্তবে ধরা যাবে কিনা।

সন্দেহের অবসান ঘটালেন ওয়েইস, বারিশ এবং থর্ন। ২০১৫ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর পৃথিবীতে বসে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের অস্তিত্ব অনুভব করলেন এই তিন বিজ্ঞানী। যে যন্ত্রে ধরা পড়ল এই তরঙ্গ তার নাম লেজার ইন্টারফেরোমিটার গ্র্যাভিটেশনাল-ওয়েভ অবজারভেটরি (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory সংক্ষেপে LIGO)। পৃথিবী থেকে ১৩০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে ১৩০ কোটি বছর আগে দুটো ব্ল্যাকহোলের একসঙ্গে মিশে গিয়ে যে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল তা ধরা পড়ল LIGO যন্ত্রে ২০১৫ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর। সফল হল শত শত বিজ্ঞানীর অর্ধ শতাব্দীর স্বপ্ন। খুলে গেল মহাকাশ গবেষণার এক নতুন দিগন্ত।

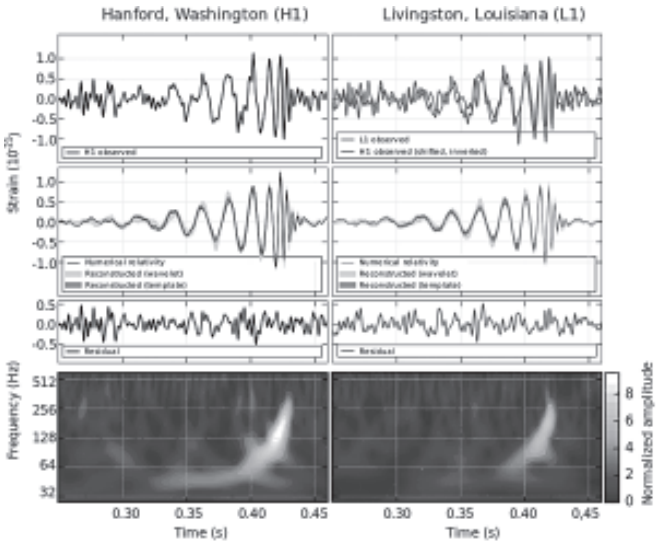

বাঁদিকে মহাকশীয় তরঙ্গের গাণিতিক অস্তিত্বের ছবি। ডানদিকে LIGO যন্ত্রে ধরা মহাকর্ষীয় তরঙ্গের ছবি

এযাবৎকাল মহাজাগতিক বস্তুসমূহের পর্যবেক্ষণে কাজে লাগানো হত বিভিন্ন ধরনের তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। যেমন, দৃশ্যমান আলো, এক্স-রশ্মি, গামা-রশ্মি ইত্যাদি। কিন্তু এমনও মহাজাগতিক ঘটনা রয়েছে যেখান থেকে কোন তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণই বেরোয় না। যেমন, সংঘর্ষে লিপ্ত দুটো ব্ল্যাকহোল। বরং সেখান থেকে বেরোয় মহাকর্ষীয় তরঙ্গ। তাই মহাকর্ষীয় তরঙ্গ জ্যোতির্বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে সুলুকসন্ধান করা যাবে ব্ল্যাকহোল, নিউট্রন স্টার ইত্যাদি মহজাগতিক বস্তুর, বর্তমান জ্যোতির্বিদ্যায় যারা অধরা।

ডক্টর রাইনার ওয়েইস-এর জন্ম ১৯৩২ সালে বার্লিনে। নিউ ইয়র্কে আসেন ১৯৩৯ সালে। স্কুলে পড়তে পড়তেই দক্ষতা দেখিয়েছিলেন উচ্চ গুণমানের শব্দ ব্যবস্থায়। যোগ দেন ম্যাসাচুসেট্স্ ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি-তে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বেন বলে। তবে সে পড়া আর হয়ে ওঠেনি। পদার্থবিদ্যায় ডক্টরেট করেন সেখান থেকেই।

ডক্টর কিপ থর্ণ-এর জন্ম উত্তর আমেরিকার লোগান-এ ১৯৪০ সালে। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে স্নাতক হয়ে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জন আর্চিবাল্ড হুইলার-এর অধীনে ডক্টরেট। হুইলার ছিলেন আইনস্টাইন-এর সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের গুণমুগ্ধ। ব্ল্যাকহোল সম্পর্কে থর্ণ-এর আগ্রহ সৃষ্টি একমাত্র হুইলার-এর জন্যই। কিপ থর্ণ বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি-এর একজন এমেরিটাস অধ্যাপক।

ডক্টর বারিশ বারি-এর জন্ম আমেরিকার ওমাহা-য় ১৯৩৬ সালে। বড় হয়ে ওঠেন লস এঞ্জেলেস-এ। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি নিয়ে যোগ দেন ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি-তে। LIGO প্রকল্পে যোগদানের আগে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কণা বিঘটন যন্ত্র সুপার কন্ডাক্টিং সুপার কোলাইডার-এর। বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি-তেই এমেরিটাস অধ্যাপক পদে রয়েছেন তিনি।

E.mail.rdebnath1961@gmail.com • M : 9477934928

খাদ্যে ভেজাল ধরবেন কিভাবে : ঘি

জয়দেব দে

সম্প্রতি সেন্ট্রাল ফুড ল্যাবরেটরির (CFL) (কীড স্ট্রিট, কলকাতা) অধিকর্তা অমিতাভ কৃষ্ণ অধিকারী এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন নদীয়ার ফুলিয়ার ঘোষপাড়ার একটি কারখানার ঘি বিপজ্জনক ও নিম্নমানের। ভেজাল ঘি। ওতে ঘি নেই, আছে বনস্পতি।

রাজ্য সরকারের এনফোর্সমেন্ট শাখা (ই.বি) ঐ ঘি-এর নমুনা সংগ্রহ করেছিল। তথ্যানুসন্ধান করে জানা যায় দুটি নামী সংস্থা ঐ কারখানা থেকে ঘি কিনে নিজেদের নামে বাজারে বিক্রি করে। প্রতিদিন প্রায় ২৫০-৩০০ কেজি ঘি ফুলিয়ার ঐ কারখানায় তৈরি হয়।

CFL এর রিপোর্টে জানা যায় ২০১১ সালের খাদ্য সুরক্ষা ও গুণমান বিধি অনুযায়ী ঐ ঘি নিম্নমানের ও বিপজ্জনক অর্থাৎ ঐ ঘি খেয়ে যেকোন সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ইবি সূত্রে আরো জানা যায় ফুলিয়ার ঐ কারখানার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হবে এবং যে দুটি নামী সংস্থা নিজেদের মোড়কে ঐ ঘি বাজারে বিক্রি করছে, তাদের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেবার কথা বলা হয়েছে। আমাদের আশা আইনানুযায়ী ভেজালদারদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ভেজাল ঘি ধরবেন কিভাবে?

১) ১ চামচ ঘি বা মাখন টেস্ট টিউবে নিতে হবে। এর সাথে ১ চামচ ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCL) ও সামান্য চিনি মিশিয়ে হাল্কা গরম করে ঝাঁকাতে হবে। এরপর দ্রবণের নীচের স্তর গাঢ় খয়েরী রঙ ধারণ করলে বুঝতে হবে ঘি বা মাখনে ডালডা (বনস্পতি) মেশানো আছে।

২) ঘি বা মাখন সামান্য গরম করে বা গলিয়ে সামান্য টিংচার আয়েডিন বা আয়োডিন দ্রবণ যোগ করলে দ্রবণ নীলবর্ণ হলে বুঝতে হবে ঘি বা মাখনে আলু সেদ্ধ মেশানো আছে।

কী ক্ষতি হবে?

১. আর্থিক ক্ষতি।
২. রক্তে কোলেস্টরল বাড়বে।
৩. হৃদরোগের সম্ভাবনা বাড়বে।

M : 8336043048

অঙ্কটা খুব মন্দ নয়

অঙ্কিতা সেনগুপ্ত

'অঙ্ক বিষয়টাই বড় ভয়ের' 'অঙ্কেতে আমি ভীষণ কাঁচা', 'অঙ্ক করতে একদম ভালো লাগে না'— অঙ্ক নিয়ে এই ধরনের মন্তব্য করেননি বা শোনেননি এমন মানুষ পৃথিবীতে দুর্লভ। অনেকের মনে তো এমন প্রশ্নও জাগে যে 'এত অঙ্ক শিখে কি হবে?' অথবা 'সবাই কি অঙ্ক পারে?' মজার কথা এই যে, ভালো লাগুক বা না লাগুক, ভয় হোক বা না হোক-গণিত সর্বত্র বিরাজমান। প্রকৃতির আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য অঙ্ক থেকে কিছু টুকরো ছবি তুলে ধরা যাক 'বিজ্ঞান অন্বেষক'-এর আয়নায়।

'আয়না' বলতেই নিজের মুখের কথা মনে পড়ে যায়। অজস্রবার আয়নায় নিজের মুখ দেখার সময় কখনও মনে হয়েছে যে এত পরিচিত বস্তুটিও একটি অঙ্ক। আমাদের মুখ ঠিক নাক বরাবর কল্পিত একটি রেখা দ্বারা সমান দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি ভাগ অপর ভাগের 'mirror-image'। একে বলা হয় দ্বিপাক্ষিক প্রতিসাম্য। অঙ্কের এক জলজ্যান্ত নমুনা যে আজীবন আমাদের একান্ত আপন হয়ে থাকে তা ভাবলে সত্যিই আশ্চর্য লাগে।

এবারে আসা যাক, আমাদের পছন্দের কথায়। খাদ্য আমাদের পছন্দও বটে প্রয়োজনও বটে। মানুষের রসনাতৃপ্তির ইতিহাসও কম

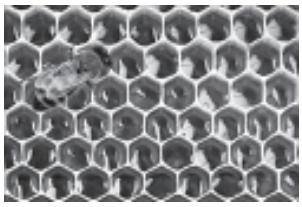

বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। এই খাদ্যতালিকায় অন্যতম নাম— মধু, যার প্রাপ্তিস্থান মৌচাক। প্রচুর ষড়ভুজাকার প্রকোষ্ঠের সমন্বয়ে গঠিত মৌচাক একটি জ্যামিতিক বিস্ময়। গণিতজ্ঞদের মতে এইরূপ গঠনের কারণে কম মোম ব্যবহার করে মধু সঞ্চয়ের জন্য অনেক বেশি স্থান পাওয়া যায়। মানে মৌমাছিরাও বেশ হিসেবি। বিস্ময়ের বিষয়, যে ষড়ভুজ গঠন করতে মানুষ কম্পাস ও স্কেল ব্যবহার করে তা মৌমাছিরা স্বাভাবিকভাবেই বানায়। তবে কি জ্যামিতিটা ওরা বেশি বোঝে?

মধু তৈরিতে ফুলের ভূমিকার কথা সবাই জানে। তাই বলে ফুলে অঙ্ক! তাও আবার হয় নাকি? অবশ্যই হয়। বহু ফুলের পাপড়ির সংখ্যা হয় 3, 5, 8, 13, 21, 34...। এই সংখ্যাগুলি হল ফিবোনাক্কি সংখ্যা। প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ফিবোনাক্কি 1202 সালে তাঁর 'Liber Abaci' গ্রন্থে ফিবোনাক্কি সংখ্যার সঙ্গে পরিচয় ঘটান পাশ্চাত্য পৃথিবীর। সংখ্যাগুলি এই ধরনের : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55...

অর্থাৎ প্রতিটি সংখ্যা তার আগের দুটি সংখ্যার যোগফল। আবার প্রতিটি সংখ্যাকে তার ঠিক আগের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে দেখা যাবে যে ভাগফলগুলি 1,61804 সংখ্যার কাছাকাছি হয়। যেমন: $1/1 = 2/1 = 2$, $3/2 = 1.5$, $5/3 = 1.667$, $8/5 = 1.6$...। এই সংখ্যাটিকে বলা হয় 'গোল্ডেন রেসিও (Golden Ratio)'।

অদ্ভুতভাবে এই ফিবোনাক্কি সংখ্যা ও গোল্ডেন রেসিও আমাদের কাছে দূরে সর্বত্র নানারূপে দেখা যায়। যেমন ধরা যাক Daisy ফুলের কথা। Daisy ফুলের বিভিন্ন প্রজাতির পাপড়ির সংখ্যা সবসময়ই ফিবোনাক্কি সংখ্যা হয়।

মানব শরীরও কিন্তু এই সংখ্যার উর্দ্ধে নয়। একটি মজার উদাহরণ হল : মানবদেহে প্রতিটি হাতে থাকে একটি করে বৃদ্ধাঙ্গুলি, প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলিতে দুটি হাড়, অন্য আঙুলগুলিতে তিনটি করে হাড়, প্রতিটি হাতে পাঁচটি আঙুল, বৃদ্ধাঙ্গুলি বাদে দুটি হাতে মোট আটটি আঙ্গুল।

আঙ্গুল তো বটেই, আমাদের DNAর গঠনেও আছে এই সংখ্যা।

ফিবোনাক্কি সংখ্যার বাহুবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্র আঁকলে পাওয়া যায় ফিবোনাক্কি আয়তক্ষেত্র ও তার থেকে পাওয়া যায় ফিবোনাক্কি স্পাইরাল

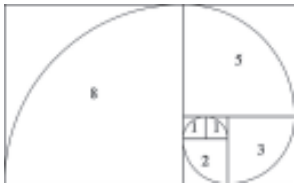

(Fibonacci Spiral)। প্রকৃতিতে এই ফিবোনাক্কি স্পাইরালের উদাহরণ অসংখ্য। শামুকের খোলের গড়ন, ফুলের পাপড়ির বিন্যাস, সমুদ্রের ঢেউয়ের আকার এমনকি ছায়াপথের গঠনও এই অঙ্কের বাইরে নয়।

বিজ্ঞানী Paul Dirac-এর ভাষায় 'এই পরিস্থিতিকে বর্ণনা করা যায় এই বলে যে ঈশ্বর নিশ্চয়ই খুব বড় গণিতবিদ যিনি ব্রহ্মান্ড রচনায় অত্যন্ত উন্নত গণিতের ব্যবহার করেছেন।'

সত্যিই তো, অঙ্ক কোথায় নেই? অঙ্ক না থাকলে কি সম্ভব হত সূর্যগ্রহণ? অত বড় সূর্যকে চাঁদ কি কখনো ঢাকতে পারতো যদি না, সূর্য ও চাঁদের ব্যাসের অনুপাত এবং পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্বের অনুপাত— এই দুটি প্রায় সমান না হত। এই দুটি অনুপাত সমান হওয়ার কারণে পৃথিবী থেকে সূর্য ও চাঁদকে প্রায় একই আকারের মনে হয়, সম্ভব হয় সূর্যগ্রহণ, অঙ্ক মেনেই। এইভাবে অঙ্ক মেনেই তৈরি হয় orb-web মাকড়সার জাল। প্রায় বৃত্তীয় সাইকেলের চাকার মতো এই জালগুলির সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মত, যে এগুলি 'highly organized' জ্যামিতিক গঠন। এরূপ গঠন জালকে করে তোলে মজবুত। এই 'design' এতটাই উন্নত যে এর থেকে উন্নততর 'design' করা সম্ভব নয়, অর্থাৎ এই নকশা 'optimized'। কোটি কোটি বছর ধরে এইভাবেই এই ক্ষুদ্র প্রাণীরা জীবনধারণ করে আসছে প্রকৃতিদত্ত গণিতের হাত ধরে।

এমনই অজস্র গণিত প্রতিক্ষণে আমাদের চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে। প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি না জানি কত গণিতের সমন্বয়। কখনও আমরা বুঝতে পারি, কখনও পারিনা; কখনও লক্ষ করি, কখনও করি না। সাধারণ হিসেবের ধারণা থেকে একটু বাইরে বেরিয়ে যদি চারিপাশের অঙ্কগুলোকে চেনা যায়, তাহলে অঙ্কটা খুব মন্দ নয়, তাই না?

E.mail.ankitasengupta57@gmail.com • M : 9748682580

নরেন্দ্র দাভোলকর : ব্ল্যাক ম্যাজিক আইন

রাজদীপ ভট্টাচার্য

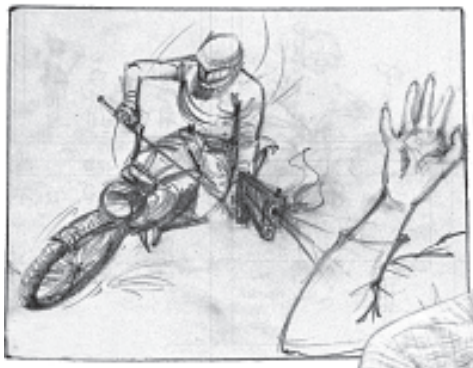

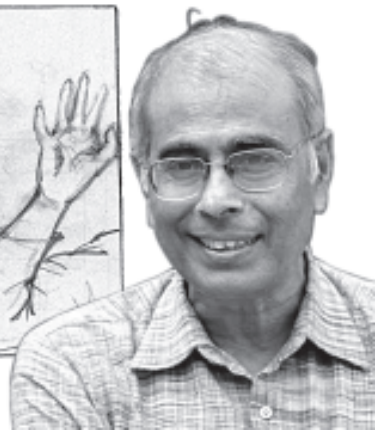

স্কেচ : সৌরভ মুখার্জী

সময় : ২০১৩ সালের আগস্ট মাস, সকাল ৭ টা ২০ মি।

স্থান : পুনে শহরে ওমকারেশ্বর মন্দিরের অদূরে একটি ব্রিজ।

প্রথম দৃশ্য : সাতষট্টি বছরের এক প্রৌঢ় মর্নিং ওয়াক সেরে হেঁটে বাড়ি ফিরছেন। এমন সময়ে এক বন্দুকধারীর আকস্মিক উপস্থিতি। পরপর চারটি গুলি। তীক্ষ্ণ শব্দে দূরে উড়ে যাচ্ছে পাখিরা। নির্জন সকালের নীরবতাকে আরো একবার কাটতে কাটতে ক্রমশ দূরবর্তী হচ্ছে একটি বাইক।

ক্যামেরা এবার জুম করছে সেই প্রৌঢ়ের দিকে। ততক্ষণে পুলিশ এসেছে। থকথকে রক্তের মধ্যে শুয়ে আছে মানুষটা। বুলেট বিঁধে রয়েছে মাথায়, বুকে। এরপর পুলিশ মানিব্যাগ ঘেঁটে বের করবে সচিত্র পরিচয়। ক্যামেরা আরো জুম করে পৌঁছে যাবে পরিচয়পত্রে। এক পরিণত মানুষের ছবি। চশমার কাঁচের আড়ালে দীপ্ত চোখগুলি। পাশে নাম— নরেন্দ্র দাভোলকর। ক্রমশ নামের অক্ষরগুলি আউট অফ ফোকাস হতে হতে জীবন্ত হয়ে উঠবে একটি কবাডি গেমের দৃশ্য।

ভারত-বাংলাদেশ কবাডি ম্যাচ। সাতারার নিউ ইংলিশ স্কুল থেকে সাংলির উইলিংডন কলেজে ভর্তি হওয়া নরেন্দ্র ভারতের কবাডি দলের অন্যতম প্রতিনিধি। এখানেই জাম্পকাট করে উঠে আসবে একটা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের দৃশ্য। ছেলেটির হাতে মহারাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে কবাডি খেলায় দক্ষতার জন্য শিব ছত্রপতি যুবা পুরস্কার তুলে দেওয়া হচ্ছে।

এরপর হয়তো ডাক্তার শিরোপা পাওয়ার দিনটির কথা। তারপর একে একে বিভিন্ন দৃশ্য। গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের কুয়োর জন্য আন্দোলন। সুবিধাবাদী মানুষদের হাতে মার খাওয়া। হিন্দু ধর্মে মহিলাদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম, অন্ধবিশ্বাস-কুসংস্কারের প্রতিবাদে মঞ্চে মঞ্চে তিন হাজারের বেশি জনসভায় দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই। মৃত্যু ভয়কে অগ্রাহ্য করে লড়াই। আর তারপর, হ্যাঁ, তারপর সেই আগস্ট মাসের সকালে থকথকে রক্তের মধ্যে পড়ে থাকা মানুষটির মুখ আবার ফোকাস করবে ক্যামেরা। ঠোঁটের কোণে স্মিত হাসি অবিরাম লুকোচুরি খেলবে মহাকালের সাথে।

না। কোনো সিনেমা নয়। এটাই জীবন। এই জীবন, এই লড়াই, মানুষের অধিকারের জন্য এই আমরণ সংগ্রাম যিনি করে গেলেন তিনিই তো নরেন্দ্র অচ্যুৎ দাভোলকর।

১৯৪৫ সালের ১ নভেম্বর অচ্যুৎ এবং তারাবাই-এর দশ সন্তানের অন্যতম নরেন্দ্রর জন্ম হয়। পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি পান একটি যুক্তিবাদী মন। ছোটবেলা থেকেই জ্যোতিবা ফুলে, সানে গুরুজী সন্ত তুকারাম প্রমুখের জীবন, ভাবনা ও বাণী তাঁকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। ধীরে ধীরে জাতিভেদ, সামাজিক অন্যায় প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলনে তিনি যুক্ত হয়ে পড়েন। ইতিপূর্বে বাবা আধব গ্রামে গ্রামে সমাজ সংস্কার আন্দোলন করছিলেন। সে সময়ে দলিত ও মুসলমানেরা কুয়ো বা তার জল সরাসরি ছুঁতে পারত না। বাবা আধবের আদর্শকে সামনে রেখে দাভোলকর এবং অভিনেতা শ্রীরাম লাগু বিভিন্ন গ্রামে 'One village, one well' শীর্ষক দাবি ছড়িয়ে দিতে থাকেন। এভাবেই ১৯৯১ সালে সাংলিতে ক্ষুব্ধ ধর্মভীরু মানুষদের কাছে তাঁরা লাঠিপেটা খান। ১৯৯৪ সালে তাসগাঁও গ্রামে পুনরায় গ্রামবাসীদের হাতে আক্রান্ত হন। তবু মানুষকে বোঝানোর কাজ, অন্ধকার ঠেলে আলোর দিকে এগিয়ে চলার কাজ থামেনি। এক্ষেত্রে তিনি পুলিশের কাছেও নালিশ জানাননি।

এরমধ্যে ১৯৬৮ সাল নাগাদ ডাক্তারি পাশ করেন দাভোলকর। বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন শায়লা'র সাথে। সন্তান দুটি, মেয়ে মুক্তা এবং ছেলে হামিদ (মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট যুক্তিবাদী নেতা হামিদ দালওয়াই কে ভালোবেসে নামকরণ)। সাতারায় বছর বারো ডাক্তারি করার পর সম্পূর্ণ রূপে সমাজ সেবায় নিজেকে যুক্ত করে ফেলেন ডা. দাভোলকর। তাঁর ডাক্তার স্ত্রী এবং পরবর্তীকালে ডাক্তার ছেলে হামিদ সাতারায় জনসেবার কাজে 'স্বয়ম' নামক হাসপাতালটিকে ব্যস্ত রেখে চলেন।

মহারাষ্ট্রে সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করে তুলতে ১৯৮৯ সালে পুনেতে ডা. দাভোলকর 'মহারাষ্ট্র অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি' (MANS) গড়ে তোলেন। তিনি হন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। চিরকাল মানুষের অন্ধবিশ্বাস, ধর্মীয় দুর্বলতা ইত্যাদিকে অবলম্বন করে এক শ্রেণির মানুষ অন্যায় কাজকর্ম, অসাধু পথে রোজগার ইত্যাদি করে চলেছে যাকে কেউ কেউ 'Superstition Industry' বলে ব্যঙ্গ করেছেন। এই সবের বিরুদ্ধে দাভোলকরের নেতৃত্বে শুরু হয় আমরণ সংগ্রাম। এই প্রকার ব্যবসা বন্ধ করার জন্য তিনি একটি বিলের খসড়া তৈরি করে মহারাষ্ট্র বিধানসভায় স্পিকারের কাছে জমা করেন। বিলটির নাম হয় "Maharashtra Prevention and Eradication of Human Sacrifice and Other Inhuman, Evil and Aghori Practices and Black Magic Bill"। বিলটি ১৯৯৫ সালে প্রথম মহারাষ্ট্র বিধানসভায় পেশ হয়। কিন্তু পাস হয় না। পরবর্তীকালে মোট সাতবার সংশোধনের মাধ্যমে বিলটি বিধানসভায় পেশ হলেও হিন্দুত্ব ও ধর্মীয় ধ্বজাধারী সদস্যদের বিরুদ্ধাচারণে বিলটি আইনে পরিণত হতে বার বার ব্যর্থ হয়।

১৯৮০ সাল নাগাদ চিকিৎসক পেশা ত্যাগ করে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে দেশের-দশের কাজে বিলিয়ে দিতে মনস্থির করেন দাভোলকর। MANS এবং অন্যান্য সমাজ সংস্কারে উৎসাহী সংগঠনগুলির হাত ধরে একের পর এক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি বিভিন্ন সামাজিক কলুষকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে শুরু করেন। মদ্যপান বন্ধ করতে সাতারায় প্রতিষ্ঠা করেন 'পরিবর্তন' নামে পুনর্বাসন সংস্থা। যার শাখা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

হিন্দুধর্মে অনেক ক্ষেত্রে মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশাধিকার না থাকার বিরুদ্ধে দাভোলকর আন্দোলন গড়ে তোলেন। এজন্য নারীদের নিয়ে আহমেদনগরে একটি মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী রাজনৈতিক দল ও পুলিশের সাথে সত্যাগ্রহীদের বিরোধ বাঁধে। দাভোলকরকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীকালে অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের উপর ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পিছনে ছিল দাভোলকরের এই আন্দোলন।

জ্যোতিষীদের ভণ্ডামী উন্মোচিত করার জন্য দাভোলকর ও শ্রীরাম লাগু ২০০৮ সালে পুরস্কারের বিনিময়ে সব জ্যোতিষীদের কাছে নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর চেয়ে বিজ্ঞাপন দেন। কিন্তু তথাকথিত সর্বজ্ঞ জ্যোতিষীদের কাছ থেকে কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না।

দাভোলকর দেখেন মহারাষ্ট্রে প্রতি হিন্দু বিবাহে ১০ কেজি চাল হিসাবে প্রতিবছর প্রায় ৩ লক্ষ হিন্দু বিয়েতে ৩০ লক্ষ কিলো চাল নষ্ট করা হয়। যেখানে রাজ্যের বহু মানুষ অভুক্ত থাকে। দাভোলকর এই প্রকার অপচয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং চাল দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণের জন্য সচেতনতা গড়ে তুলতে থাকেন।

দেবদাসী প্রথা, ডাইনি প্রথা, নরবলি, অন্ধবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে নির্যাতন ও অর্থ উপার্জন ইত্যাদির বিরুদ্ধে মানুষকে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন দাভোলকর।

মৃত্যুর মাসখানেক আগে তথাকথিত ধর্মগুরু আশারাম বাপুর নেতৃত্বে পুনে শহরে হোলি উদ্‌যাপন উপলক্ষে পুনে পৌরসভার এক লক্ষ গ্যালন পানীয় জল অপচয়ের বিরুদ্ধে ডা. দাভোলকরের নেতৃত্বে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। গোঁড়া হিন্দু সংগঠনগুলি তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

ব্যক্তিগত জীবনে যুক্তিবাদী-নাস্তিক দাভোলকর কিন্তু কখনোই ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে ছিলেন না। ভারতীয় সংবিধানকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। তাই সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেকের ধর্মীয় আচরণের অধিকার তিনি মানতেন। কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে অন্যায় শোষণ অত্যাচার লোক ঠকানো—ইত্যাদিকে তিনি ঘৃণা করতেন। তাঁর লেখা বইগুলিতে আমরা তাঁর মুক্ত চিন্তা ভাবনার পরিচয় পাই। 'অন্ধবিশ্বাস উন্মূলন', 'শ্রদ্ধা অন্ধশ্রদ্ধা', 'অন্ধশ্রদ্ধা বিনাশায়', The Republic of Reason প্রভৃতি বইতে দাভোলকর নিজেকে প্রকাশ করেন। 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদক রূপে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সাহসী। এভাবেই গোড়া হিন্দুদের সাথে তাঁর সংঘাত ক্রমশ চরমে ওঠে। ভণ্ড ধর্মীয় নেতা, গুরু এবং তাদের চ্যালা-চামুণ্ডাদের দু'চোখের বিষ হয়ে ওঠেন তিনি। বোধহয় এই সবকিছুর ফলশ্রুতি ২০১৩ সালে ২০ আগস্ট সেই নৃশংসতা।

মুক্ত মনা ডা. দাভোলকরের মৃত্যু সচেতন ভারতবাসীর কাছে অপরিমেয় ক্ষতি। তবে এই মৃত্যু মানে কখনোই যুক্তিবাদী আন্দোলনের সমাপ্তি নয় বরং এ যেন এক নতুন সূচনা। নিজের মৃত্যুর বিনিময়ে নিজের স্বপ্নকে সফল করে গেছেন দাভোলকর। তাঁর হত্যার ঠিক পরের দিন জনরোষ থেকে রক্ষা পেতে মহারাষ্ট্র সরকার Black Magic Bill বিধানসভায় পেশ ও পাস করায়। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বিলটি আইনে পরিণত হলে দীর্ঘ সংগ্রামের ইতি ঘটে।

সংক্ষেপে ব্ল্যাক ম্যাজিক আইন, ২০১৩ অনুযায়ী মহারাষ্ট্রে ১২টি ধারায় নিচে উল্লিখিত কাজগুলিকে অপরাধমূলক বলা হয়েছে এবং শাস্তির বিধান করা হয়েছে।

১) ভূত তাড়াবার নামে আঘাত, অত্যাচার করা, মানুষের মল-মূত্র খাওয়ানো।

২) নিজেকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে জাহির করা, এভাবে ভয় দেখানো ও ঠকানো।

৩) অলৌকিক ক্ষমতার নাম করে মানুষের জীবন বিপন্ন করা, শরীরে যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত সৃষ্টি করা।

৪) অর্থলোভে অমানবিক কাজ করা, নরবলি দেওয়া।

৫) অলৌকিকতার দাবি করে কাউকে অনুসরণ করতে বলা বা নির্দেশ মানতে বাধ্য করা।

৬) অন্যের ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য কাউকে দায়ি করে শয়তান ভর করেছে এমন বলে হয়রানি করা।

৭) ডাইনি বা ডাকিনি বিদ্যা চর্চার অজুহাতে কাউকে উলঙ্গ করে হাঁটানো।

৮) প্রেতাত্মাকে আহ্বানের অধিকারী দাবী করে কাউকে ভয় দেখানো, ডাক্তারের কাছে যেতে মানা করা, অমানবিক কাজ করানো ইত্যাদি।

৯) কুকুর, সাপ, বিছে ইত্যাদি কামড়ালে ডাক্তারের কাছে যেতে বাধা দিয়ে ম্যাজিক রেমিডি নিতে বাধ্য করা।

১০) আঙুল দিয়ে শল্য চিকিৎসা বা ভ্রূণের লিঙ্গ পরিবর্তনের ক্ষমতা জাহির করা।

১১) অলৌকিক ক্ষমতার কথা বলে বা বন্ধ্যাত্ব দূর করার অজুহাতে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা।

১২) মানসিক প্রতিবন্ধীকে ব্যবহার করে তাকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী দাবী করা।

উপরের ১২টি ধারার কাজ অপরাধমূলক এবং বিধিভঙ্গকারীদের ৬ মাস থেকে ৭ বছর জেল সহ ৫ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানার কথা বলা হয়েছে। অপরাধগুলি জামিন অযোগ্য ও Cognizable।

ডা. দাভোলকরের মৃত্যুর বিনিময়ে মহারাষ্ট্রে এই আইনের স্বীকৃতি এক যুগান্তকারী ঘটনা। একে অনুসরণ করে কর্ণাটকে ২৩টি অন্যায় রীতিকে নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনা ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের আনাচে কানাচে কুসংস্কার, ডাইনি প্রথা, ধর্মীয় বাবা কিংবা গুরুমাদের দৌরাত্ম্য রোধেও এরূপ আইন আজ বড় প্রয়োজন। আর আমাদের লক্ষ্য যখন 'স্বচ্ছ ভারত' তখন ভারতবর্ষের বুক থেকে সকল প্রকার সামাজিক কলুষ, ধর্মীয় অন্যায় দূর করার কাজে দাভোলকরের ভাবনা, ব্ল্যাক ম্যাজিক আইন হোক আমাদের গন্তব্য। মৃত্যু অতীত জীবনে সাধারণ ভারতবাসীর মনে-মননে চিরজীবী হয়ে থাকুন নরেন্দ্র অচ্যুৎ দাভোলকর।

E.mail.rajdip5678@gmail.com • M : 9836569850

সাধারণের স্বাস্থ্য : কয়েকটি পরামর্শ

ডা. গৌরব রায়

মানুষ মরণশীল। রোগব্যাধিও হতে পারে। যাতে রোগব্যাধি না হয় তার ব্যবস্থা এবং রোগব্যাধি হলে সঠিক চিকিৎসা করতে হবে। প্রকৃতির ছন্দে যদি আমরা এগোই তাহলে দেখা যাবে আমাদের শরীর ভালো থাকে। আমাদের উচিত সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুম থেকে ওঠা। অপরূপা সবুজ প্রকৃতিকে কিছুক্ষণ নিরিক্ষণ করা। আর উচিত বেশি রাত না জাগা। রাত ১০/১১টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়া। দুপুরে সূর্যের যখন খুব তেজ তখন কোন ছায়াসিক্ত অঞ্চলে থাকা আর সকালের মিঠে রোদকে গায়ে মাখা। বৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রথম স্তরের অ্যাসিডিক রেনকে এড়িয়ে চলা। তীব্র দাবদাহে ওজনস্তর ছিন্ন হয়ে অতিরিক্ত ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মির সংস্পর্শ থেকে বাঁচতে সান ক্যাপ, সান গ্লাস, ত্বকে সানক্রিম লোশন, দেহ ঢাকা সুতির পোশাক, ঢাকা জুতো ও মোজা পরা। বেশি ঘাম হলে বা বেশি দাবদাহে সান স্ট্রোক ও ডিহাইড্রেশন আটকাতে বেশি করে জল ও সরবত খাওয়া, শীতল পরিবেশে থাকা, চলাফেরায় শীততাপনিয়ন্ত্রিত যানবাহন অথবা ছাতা, সানক্যাপ ইত্যাদি ব্যবহার করা। একটি নির্দিষ্ট সময়, সকালের দিকে হলেই ভাল হয়, মলত্যাগ ও স্নান করা। সকাল আটটা / নটার মধ্যে প্রাতঃরাশ, দুপুর একটার মধ্যে মধ্যাহ্নাহার এবং রাত নটার মধ্যে নৈশাহার খাবার চেষ্টা করা। প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় ঘুম থেকে ওঠা, খাওয়া, ঘুমোনো ইত্যাদি অভ্যাস করা ও বজায় রাখা।

● বিশ্রাম ও ঘুম

পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও ঘুম সুস্থ মন ও শরীরের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক ছয় থেকে সাত ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন। Non Rapid Eye Movement Sleep (NREM) ও REM দুটি ধরেই। শিশু, বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী যাদের শরীর ও মস্তিষ্ক গড়ে তোলার সময় তাদের, যারা প্রবল কায়িক শ্রম করেন বা খেলোয়াড় কিংবা প্রসূতি ও অসুস্থদের বেশি ঘুমের প্রয়োজন হয়। প্রতিদিন রাতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমোতে যাওয়া উচিত। শিশুরা সারা দিন ভাগ ভাগ করে তাদের প্রয়োজন মতো ঘুমোবে। প্রসূতি এবং বয়স্করা দুপুরে কয়েকঘণ্টা ঘুমোতে বা বিশ্রাম নিতে পারেন। বয়স বাড়লে ও কায়িক শ্রম কমলে অনেক সময় ঘুমের চাহিদা কমে যায়। ঘুম নিয়ে ঘ্যানঘ্যানানির প্রয়োজন নেই, একেবারে পরিত্যজ্য ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোনো। ঘুম না এলে হাঁটাহাটি কিংবা ধ্যান বা শবাসন করতে পারেন। বই পড়ে বা কোন সৃজনশীল কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখুন। সারাদিন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকলে, নিয়মিত খেলাধূলা, ব্যায়াম, সাঁতার কাটলে ঘুম আপসেই হবে। এরপরও খুব সমস্যা হলে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। কিছু অসুখের জন্য পার্শ্ব চিকিৎসা হিসাবে ঘুমের ওষুধের চল আছে। তথাপি বলব সেক্ষেত্রে ঘুমের ওষুধ না খেতে চেষ্টা করা বা কম মাত্রা ও পরিমাণে খাওয়া অথবা তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া।

● খাওয়া দাওয়া

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খাদ্যর পরিমাণ, খাদ্যবস্তু, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতি অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। শরীরের প্রয়োজন, বয়স, পরিপাক করার ক্ষমতা, পুষ্টি, জিভের স্বাদ ও রসনা এবং ভালো লাগার অনুভূতি, ক্ষুধা মেটানো, খাবার পাওয়ার সুযোগ, অর্থনীতি, ভৌগোলিক অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা, তাপমাত্রা, ঋতু, রান্না ও সংরক্ষণের সুযোগ, জ্বালানির সংস্থান, হাতে সময়, রুচি, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি প্রভৃতি।

এক কথায় আমাদের খাদ্য বস্তু হওয়া চাই পর্যাপ্ত (Adequate); সুষম (Balanced) অর্থাৎ অত্যাবশকীয় কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিনস্, মিনারেলস্, ট্রেস এলিমেন্টস্, অ্যান্টি অক্সিডেন্টস্, রাফেজ প্রভৃতির উপযুক্ত মান, পরিমাণ ও মিশ্রণ (একেক বয়স, পর্যায়ে ও বৃত্তিতে একেক রকম হবে। উদাহরণ নবজাতক, শিশু, যুবক, খেলোয়াড়, প্রসূতি ইত্যাদি), পুষ্টিকর (Nutritious); স্বাস্থ্যসম্মত (Hygienic) এবং গ্রহণযোগ্য (Accepted)।

সকালে উঠে এক গ্লাস জল খেলে অ্যাসিডিটির সমস্যা কমবে এবং মলত্যাগের সুবিধা হতে পারে। পানীয় জল সারাদিনে পর্যাপ্ত পরিমাণে খেতে হবে। এক এক ঋতু ও বয়সে এর প্রয়োজনীয়তার তারতম্য হতে পারে। পানীয় জলকে হতে হবে নিরাপদ (Safe) অর্থাৎ সংক্রমণ ও ক্ষতিকারক পদার্থমুক্ত; পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় লবণ ও খনিজ পদার্থযুক্ত; গ্রহণযোগ্য। প্রতি দুটি ব্লকের মধ্যে একটিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পরীক্ষাগারে প্রতি ছয় মাস পর পর জল পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। ভূতলের (Ground Water) জলে আর্সেনিক, ফ্লোরাইড, আয়রণ প্রভৃতির সমস্যা; নদীনালা, খাল-পুকুরের জলে (Surface Water) সংক্রমণ ও হেভিমেটাল পয়জনিং-এর সমস্যা এবং বৃষ্টির জলে (Rain Water) দূষণের সমস্যা থাকতে পারে। তাই উচিত কর্পোরেশন, পুরসভা, পি.এইচ.ই-র পরিশোধিত জল পান। যেখানে সে সুযোগ নেই Rain Water Harvesting করে থিতিয়ে গ্রহণ অথবা নদী-জলাশয় থেকে জল সংগ্রহ করে থিতিয়ে, ছেঁকে, ফুটিয়ে, ঠাণ্ডা করে খাওয়া। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে ক্লোরিন ট্যাবলেট মিশিয়ে পরিশ্রুত করে খাওয়া যেতে পারে।

সকালের জলখাবার আটটা নটার মধ্যে খেতে হবে এবং কিছুটা ভারি খেতে হবে প্রয়োজন ও বয়স অনুযায়ী। আটা অথবা মিশ্র দানার (আটা, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, রাগি) রুটি, আটার পাউরুটি, পান্তা ভাত বা জৈব

চালের ভাত (অল্প পরিমান) সঙ্গে মিশ্র সবজি ও/অথবা ডাল (ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুসুর, মুগ, ছোলা, মটর, রাজমা...)। সঙ্গে একটি ডিম সিদ্ধ/ওমলেট (ডিম অতি উন্নত মানের ও সহজপাচ্য প্রোটিন)। তার সাথে কোন মরসুমি জৈব ফল অথবা অঙ্কুরোদ্গম ছোলা। আর এক গ্লাস পাতিলেবুর সরবৎ। অল্পবয়সী ও যুবক-যুবতীরা সরবতের বদলে এক গ্লাস ভাল মানের গরুর দুধ খেতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে জানাই নবজাতকের জীবনের প্রথম ৬ মাস একমাত্র খাদ্য মাতৃদুগ্ধ। ছয় মাস বয়স থেকে মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ভাত, ডাল, সবজি, ডিম সিদ্ধ করে নরম করে খেতে শুরু করবে। খেতে শুরু করবে তাজা

ফলের রস। যে কোনো স্তন্যপায়িপ্রাণীর নবজাতকের ক্ষেত্রে একমাত্র এবং শিশুদের ক্ষেত্রে প্রধান ও সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য মাতৃদুগ্ধ। বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীরা ভাল মানের গরুর দুধ খেতে পারেন। এতে ভাল মানের প্রোটিন, ফ্যাট, ক্যালসিয়াম রয়েছে। অনুপস্থিত আয়রণ। তবে ভেজাল ও সংক্রামিত দুধ খেলে হিতের চাইতে ক্ষতি বেশি। পশুর স্বাস্থ্য; পশুশালা, দোয়ানো, সংরক্ষণের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যসম্মতা অবশ্যই বিবেচনার বিষয়। যাদের দুধ হজম হয় না বা ল্যাকটোজেন ইনটলারেন্স আছে তাদের দুধ থেকে ছানা বা দই তৈরি করে দেওয়া যেতে পারে। গরমকালে খাবার সঙ্গে বাড়িতে পাতা খাঁটি দুধের দই অত্যন্ত উপকারী খাদ্য এবং হজম সহায়ক। বয়স্ক মানুষেরা জলখাবারে চিড়ে, ছাতু, মুড়ি, খই, দই, কলা দিয়ে জলখাবার খেতে পারেন। গরম আবহাওয়ায় বারবার চা না খেয়ে বারবার পাতিলেবু-নুন-চিনির সরবৎ, ঘোল, লস্যি, তেঁতুল-পুদিনা-নুন-গুড়ের সরবৎ প্রভৃতি খেলে খুব উপকার।

কাজের ফাঁকে সকাল সাড়ে দশটা, এগারটা নাগাদ একবার চা, কফি সঙ্গে বিস্কিট, কেক খাওয়া যেতে পারে। বোরডোম, একঘেয়েমি, ঘুমভাব কাটাতে কিংবা একটু চার্জ হতে বা উৎসাহ আনতে চা-কফিতে থাকা কেফিন শরীর-মনকে একটু চাঙ্গা করে, সামান্য কিছু অ্যান্টি অ্যাক্সিডেন্টস্ থাকে। অন্যদিকে চা-কফি বারবার খেলে গ্যাসট্রাইটিস, অ্যাসিডিটি ইত্যাদি হয়। চা বেশি খেলে ফ্লুরোসিস হয়, কফির ক্ষেত্রে হার্টের সমস্যা। খুব শীতল অঞ্চল বাদ দিয়ে আমাদের গরম-আর্দ্র আবাহাওয়ায় বারবার খেলে চা খাওয়া ক্ষতিকর। আর রাস্তার সস্তার চায়ের দোকানের চায়ে না থাকে চা, দুধে না থাকে দুধ, জল অপরিশ্রুত এবং মাঝখান থেকে একগাদা চিনি খাওয়া হল। তাই আমাদের জলবায়ুতে গরমকালে দিনে দু-তিনবার সরবৎ খাওয়া অনেক বেশি উপকারী এবং শীতকালে দিনে বড়জোর দু-তিনবার চা খাওয়া যেতে পারে। প্রিজারভেটিভ, কৃত্রিম রঙ, কৃত্রিম গন্ধ যুক্ত এবং প্যাকেজ খাদ্য এড়িয়ে চলাই ভাল।

দুপুরের খাওয়া সাড়ে বারোটা, একটার মধ্যে করলে ভাল হয়। হজমে সুবিধা হয়। এক এক জায়গায় একেক রকম খাওয়ার সংস্কৃতি। তথাপি সাধারণভাবে যা খাওয়া উচিত : অল্প পরিমাণ ভাত ও দু-তিনটে হাত রুটি, ডাল, শাক, তরকারি, মাছ (ছোট মাছ বেশি ভাল), চাটনি, টক দই ও সালাড। গরমকালে শুক্তো ও শীতকালে আলু, পটল, বেগুন ভাজা যুক্ত

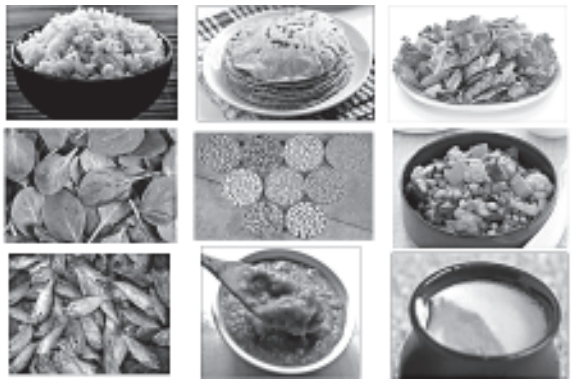

করা যেতে পারে। গরম কালে তেঁতুল, আম প্রভৃতির টকও খুব উপকারী। খাবার শেষে আম, কাঁঠাল, জাম, আনারস, বাতাবি লেবু, পেয়ারা ইত্যাদি কোন ফল যুক্ত করতে পারলে ভাল। তরকারি ও ফল সেই ঋতুতে যা হয় তাই খেতে হবে। অসময়ের কৃত্রিম ফলন বা কোল্ড স্টোরেজের পুরনো না খাওয়াই ভাল। খাবার হতে হবে পরিমিত, বেশিও না কমও না। ভাল জলে পরিষ্কার স্টিলের বা কলাপাতা, শালপাতা,পদ্মপাতার থালা-গ্লাস-বাটিতে খাদ্য পরিবেশন করতে হবে। প্লাস্টিক, থার্মোকল ইত্যাদি চলবে না। জৈব খাবার খেতে হবে। তবে জৈব খাদ্য অনেক দামী, তার উপর অসাধু ব্যবসায়ীরা জৈবের মধ্যে অনেক অজৈব ঢুকিয়ে দেয়। তাই বাড়ির সামনে, পিছনে, পাশে, ছাদে, বারান্দায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত জৈব চাষ করে প্রয়োজনীয় তরকারি, শাক, ফল উৎপাদন করে নেওয়া সম্ভব ও উচিত। খাবার হতে হবে পরিষ্কার ও তাজা। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সমীক্ষায় দেখা গেছে মলত্যাগের পর, খাবার আগে ও খাবার পরিবেশনের আগে সাবান দিয়ে হাত ধুলে আন্ত্রিকের প্রকোপ ৫০% কমে যায়। তরকারি, শাক, ফল ভাল করে ধুতে হবে কৃমি ও অন্যান্য সংক্রমণ পরিহার করতে। শাক, তরকারি, মাছ, মাংস, ডিম ভাল করে সেদ্ধ করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রী, শ্রমিক-কর্মচারী প্রমুখ যারা কর্মসূত্রে দুপুরটা ঘরের বাইরে এবং কর্মক্ষেত্রে থাকেন, সেখানে ভাল ক্যান্টিনের ব্যবস্থা না থাকলে সকালে লাঞ্চের মেনু খেয়ে (যতটা সম্ভব) দুপুরে টিফিনে প্রাতঃরাশের মেনু অথবা বাড়িতে তৈরি স্যান্ডউইচ, চাওমিন, পাস্তা, চিড়ের পোলাও, সুজি, ধোসা, ইডলি, চানা-বাটোরা, পাওভাজি, টোস্ট উইথ বাটার অ্যান্ড গোলমরিচ, টোস্ট-জ্যাম প্রভৃতি খেতে পারেন।

বিকেলে হালকা স্ন্যাকস (মুড়ি-ছোলা-বাদাম ইত্যাদি), এক কাপ চা ও দুটো বিস্কিট খাওয়া যেতে পারে। বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, খেলোয়াড় ও কায়িক শ্রমিকদের এ-সময় একটা পুষ্টিকর সহজলভ্য টিফিনের ব্যবস্থা করতে হবে। ভাজাসুজি, চপ, সিঙারা, জিলিপি ইত্যাদি বর্জনীয়। রাতের খাবার অবশ্যই রাত নটা দশটার মধ্যে খেতে হবে। মিশ্র হাতরুটি, মিশ্র সবজি, ছানা, চিকেন, ফল, স্যালাড। রাতে খাবার অন্তত এক ঘণ্টা পর ঘুমানো উচিত। খাবার সঙ্গে সঙ্গে জল খাওয়া উচিত নয়। বজ্রাসন ও অল্প পায়চারী করা যেতে পাবে। বাইরে খাওয়া, বারোয়ারী ভোজে খাওয়া বর্জন করা উচিত। নিরুপায় হলে অথবা সামাজিক বাধ্যবাধকতার কারণে গ্রহণ করতে হলে নির্বাচন করে খাওয়া উচিত। খাবার ঢেকে রাখা উচিত যাতে ধুলো অথবা মাছি বা পিঁপড়ে না বসে। মাছি থাকলে বুঝতে হবে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গেছে, তাই খুঁজে মাছির আঁতুড়ঘরগুলি নষ্ট করে দিতে হবে। তরল বর্জ্য পয়ঃপ্রণালী দিয়ে পুরসভার নলে, নর্দমায় অথবা নিরাপদ স্থানে ফেলতে

হবে, কোথাও জল এবং নোংরা জল জমতে দেওয়া যাবে না। কঠিন বর্জ্যকে দুটো পাত্রে রাখতে হবে। একটিতে বায়োডিগ্রেডেবল অন্যটিকে নন-বায়ো ডিগ্রেডেবল পদার্থ। প্রতিদিন সরাতে হবে। বায়োডিগ্রেডেবল সলিড ওয়েস্ট দিয়ে কম্পোজড সার তৈরি করে ঘরের Backyard, Rooftop, Urban Farming-র কাজে লাগাতে হবে। বাকিটা এবং ননবায়োডিগ্রেডেবল পদার্থগুলি, পঞ্চায়েত পুরসভার সাহায্যে বা নিজ উদ্যোগে নিরাপদ জায়গায় সরাতে হবে। বছরে দুবার সপরিবারে কৃমির ওষুধ খাওয়া উচিত।

('বিজ্ঞানকর্মী ও স্বাস্থ্য' প্রবন্ধটি থেকে সংকলিত।)

পরবর্তী সংখ্যায় সমাপ্য

E.mail.gaurab18@gmail.com • M : 9153320581

পৃথিবীর আয়ু আর ১০০ বছর

বিবর্তন ভট্টাচার্য

''পৃথিবীর আয়ু আর ১০০ বছর।'' কথাটি আমার নয়, স্টিফেন ডব্লু হকিং-এর। ৬২ বছর পরে আবার বিজ্ঞানীদের রাস্তায় নামার পালা। পরমাণু অস্ত্রের প্রতিযোগিতা রদের আহ্বানে দার্শনিক রাসেল এবং বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে যৌথ ইস্তাহার প্রকাশ করতে হয়েছিল এই পৃথিবীকে বাঁচাতে। ততদিনে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে মার্কিন পারমাণবিক বোমায় আড়াই লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

গত জুন মাসে ৭৫ বছর বয়সে হকিং বিশ্ব মানবতার কাছে আকুল আহ্বান জানান এখনই দেশের ও রাষ্ট্রের সীমানা ভুলে একজোট হয়ে পথে নামতে হবে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে মানবসভ্যতা টিকিয়ে রাখতে গেলে। নাহলে আর ১০০ বছরের মধ্যে অন্য গ্রহে বসবাস করতে হবে মানবজাতিকে। সরাসরি আঙুল তুলেছিল বিশ্বের সবচেয়ে মানবধ্বংসকারী পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে অভিযুক্ত বর্তমান মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি কিমের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছেন হকিং।

পৃথিবীর প্রথম সারির গবেষণা পত্রিকা নেচার ক্লাইমেট চেঞ্জ-এ জুলাই মাসে তাঁর দুটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে যাতে স্টিফেন ডব্লু হকিং গাণিতিক ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে পৃথিবীতে মানুষ ও জীবনের অস্তিত্ব আর ১০০ বছর। স্টিফেন জুনের ৪ তারিখে ব্রিটিশ সংবাদ-সংস্থা বি.বি.সি. কে বলেন এই হাজার হাজার বছরের মানবসভ্যতার মৃত্যু ত্বরান্বিত এবং অন্য গ্রহে বসবাসের কথা উনি বারংবার বলেন।

বলা হয়েছে পৃথিবীর তাপমাত্রা ২১০০ সাল নাগাদ ২° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে। পৃথক ভাবে করা দুটি গবেষণায় এই কথাই বলা হয়েছে। সংবাদ সংস্থা C.N.N. এই সংবাদ প্রকাশ করে বলেছে যে আলাদা গবেষণার সিদ্ধান্ত এক অর্থাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবেই। এই গবেষণায় পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে এই শতাব্দীর শেষপর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২° সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ৯৫ শতাংশ। আর ১.৫°-র নীচে থাকার সম্ভাবনা ১ শতাংশেরও কম। এই ২° সীমা ২০১৬ সালে প্যারিস চুক্তিতে নির্ধারিত। হিসাব কষে দেখানো হয়েছে যদি আমরা এই সীমানা অতিক্রম করি তাহলে উত্তরমেরুর বরফ গলে পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রাণীজগতের পরিবর্তন হবে। সমুদ্রের পারের মানুষদের উদ্বাস্তু হওয়া, বহু প্রজাতির বিলুপ্তি, ভয়ংকর খরা, দাবানল বৃদ্ধি, ঘনঘন ঘূর্ণিঝড়, পানীয় জলের সংকট, ভূমিকম্প এবং ফসল উৎপাদন হ্রাস শুরু হয়ে গিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু-র দেওয়া তথ্যে ১ কোটি ২৬ লক্ষ মানুষ চরম আবহাওয়া ও দূষণজনিত কারণে প্রতি বছর মারা যান এই পৃথিবীতে। ২০৩০ সাল থেকে ২০৫০ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনে মৃত্যুর সংখ্যা আরও ২ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষের মৃত্যু যোগ হবে।

এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এক দিন আগে বি.বি.সি. সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্টিফেন ডব্লু হকিং বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন, গ্রহাণুর ধাক্কা এবং জনবিস্ফোরণ থেকে পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে আগামী ১০০ বছরের মধ্যে মানবজাতিকে অন্য গ্রহে বসতি স্থাপন করতে হবে। পৃথিবী এবং মানবতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এখনই এই গ্রহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়া উচিত। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে বেরিয়ে অসার সিদ্ধান্তকে নিন্দা করে বলেন যে, ট্রাম্প পৃথিবীর মৃত্যুকে খাদের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়েছে। এই গ্রহকে শুক্র গ্রহের মত জ্বলন্ত বাড়িতে পরিণত করেছে। সেখানে ২৫০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও সালফিউরিক অ্যাসিড বৃষ্টি হয়।

কেমব্রিজের বিশিষ্ট অধ্যাপক প্রশ্ন রাখেন হকিংকে, মানুষ কী পারবে তার সমস্যা সমাধান করতে? হতাশা প্রকাশ করতে করতে হকিং-এর বক্তব্য পৃথিবীতে মানুষের উপস্থিতি হাতে গোনা কয়েকটা দিন মাত্র। আমি ভীত এই ভেবে যে, অভিযোজনের মধ্যে দিয়ে মানুষের জিনোমের মধ্যে ভয়ংকর লোভ ও আগ্রাসন ঢুকে পড়েছে। কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না সংঘর্ষ কমার। লক্ষ লক্ষ মানুষকে ধ্বংস করার যুদ্ধাস্ত্র এবং সমরপ্রযুক্তির বিকাশ ধ্বংসাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনবেই।

আমরা যারা পরিবেশের কথা অত্যন্ত সততার সাথে ভাবি বা কিছু গাছ লাগাই বা গাছ কাটার বিরুদ্ধে অথবা জলাভূমি ভরাট বা নদীরক্ষার লড়াই চালাই তারা সেই কাজ করেই সন্তুষ্ট ও দারুণ খুশি। কিন্তু বর্তমানে আপনার এই কাজ রাষ্ট্রনায়কদের বিরুদ্ধে যাঁরা পৃথিবীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করছেন তাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের দায়িত্ব নিতে হবে পরিবেশকর্মীদের। আমার জানা নেই এর পরেও এই গ্রহের অস্তিত্ব আর কতদিন? ইতিমধ্যে মহাকাশ বিজ্ঞানীগণ মঙ্গলগ্রহে মানুষের বসবাসের ব্যবস্থার ব্যাপারে গভীর মনোনিবেশ করেছেন। মঙ্গল-অভিযানের ব্যাপারে পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানী বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করছেন। একই দিনে মেক্সিকোতে প্রবল ভূমিকম্প আর মুম্বাই এয়ারপোর্টের রানওয়েতে প্লেন ডুবে যাওয়ার মতো ঘটনা আমাদেরকে ভাবায়। হকিং কোনো জ্যোতিষী নন তাছাড়া পথিবীর মৃত্যু তাঁর কাছে কাম্য নয়। উনি কিভাবে আমাদের বসবাসযোগ্য ধরিত্রী ভালো থাকবে সেই সত্যি কথাটি বলেছেন মাত্র। আসলে এই ইনকনভেনিয়েন্ট ট্রুথ আমাদেরকে আরো ভাবাবে বলে মনে করি।

E.mail.bibartancbss@gmail.com • M : 9332283356

আমরা সবাই তারার অংশ

অমিতাভ চক্রবর্তী

সমস্ত জীবকূলের মধ্যে বুদ্ধি ও মেধায় সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ সেই অতীত কাল থেকেই প্রকৃতি ও জগৎকে জানতে চেয়েছে। খুঁজে বের করেছে প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন। তথ্য, তত্ত্ব ও স্বজ্ঞার মিশেলে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে অণু-পরমাণু সহ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে। এক সময়ে যা সীমাবদ্ধ ছিল কেবল দার্শনিক চর্চায় আজ সেটাই বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক অবধি আমাদের ধারণা ছিল ব্রহ্মান্ড সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তৈরি হয়েছে আমাদের জানা অজানা সমস্ত মৌল। ততদিনে অবশ্য মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা গেছে। যদিও ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন নিয়ে তৈরি পারমানবিক গঠন তখনও অজানা। এরপর ১৯৩০-এর দশকে বিজ্ঞানীরা বললেন বিগব্যাং (Big Bang) থিওরির কথা। 'বিগব্যাং' অর্থাৎ মহাবিস্ফোরণ। প্রায় চোদ্দ লক্ষ কোটি বছর আগে এক মহাজাগতিক

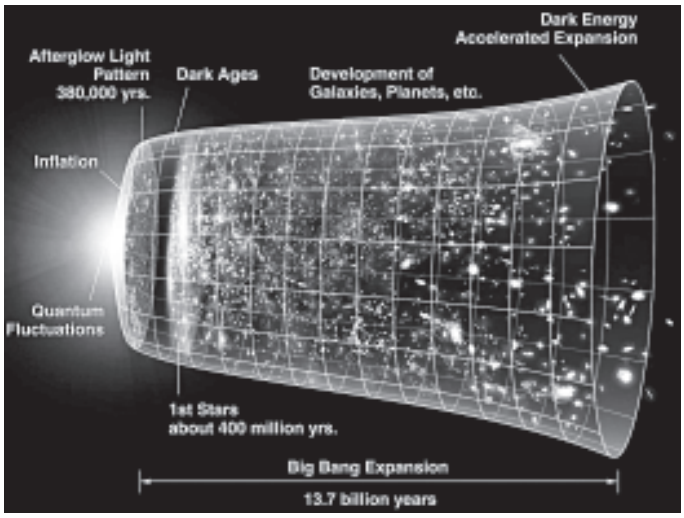

সময়ের স্কেলে মহাবিস্ফোরনের প্রভাব

বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে সূচনা হয়েছিল এই মহাবিশ্বের বা ব্রহ্মাণ্ডের। এ যেন এক বিন্দু থেকে সিন্ধুর সৃষ্টি! পদার্থ ও শক্তি দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে যাচ্ছিল চারদিকে। কার্যকর হতে শুরু করছিল স্থান-কাল (Space-time)। তৈরি হল বিভিন্ন মৌল (elements)। পদার্থবিদ জর্জ গ্যামো তো হিসেব কষে দেখিয়েছিলেন যে বিগব্যাং-এর পর প্রায় দশ মিনিটের মধ্যেই আমাদের চেনা সমস্ত মৌল সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ আমাদের পছন্দের যে কোনো সুস্বাদু খাবারের ডিশ তৈরির আগেই কিনা বিগব্যাং-এর উনুনে এতো মৌল তৈরি হয়ে গিয়েছিল!

পরবর্তী কয়েক দশকে এই থিওরী নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে অনেক মতবিরোধ হয়েছিল। তবে ১৯৩৯ সাল নাগাদ পদার্থবিদ হান্স বেথে প্রমাণ করলেন যে সূর্য সহ অন্যান্য নক্ষত্রের বিপুল পরিমাণ তাপের যোগান আসে হাইড্রোজেন সংযোজন (Fusion) প্রক্রিয়ায়। যেখানে নক্ষত্রের অন্দরের বিপুল তাপ ও চাপে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি সংযোজিত হয়ে (Proton-proton chain reaction) হিলিয়ামে পরিণত হয় এবং উৎপন্ন হয় প্রচুর শক্তি। সে না হয় হল। কিন্তু তাতে

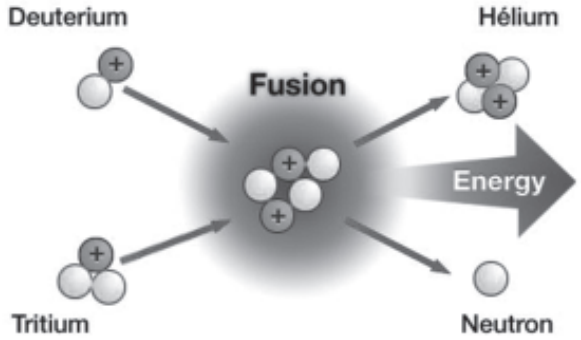

হাইড্রোজেন সংযোজন

তো ব্রহ্মাণ্ডের সামগ্রিক হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের আনুপাতিক পরিবর্তন হওয়ার কথা, খুব সামান্য হলেও। আর অন্যান্য মৌলের ক্ষেত্রে এই রকম কোনো প্রভাবই থাকার কথা নয়। কিন্তু টেলিস্কোপের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন আরো তথ্য পাওয়া গেল, সেসব বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা দেখলেন অধিকাংশ তরুণ নক্ষত্রে মৌল হিসাবে আছে কেবল হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম, যদিও পুরোনো নক্ষত্রগুলিতে কার্বন সহ বেশ কিছু অন্যান্য মৌল রয়েছে। এমনকি কোনো কোনো নক্ষত্রে তো টেকনেশিয়াম (technetium)-এর মতো চূড়ান্ত অস্থায়ী মৌল (যার পৃথিবীতে কোনো অস্তিত্বই নেই)-এর উপস্থিতিও লক্ষ্য করা গেছে। অর্থাৎ অকল্পনীয় তাপ ও চাপের প্রভাবে উদ্ভূত বিশেষ রাসায়নিক পরিমণ্ডলে নক্ষত্রের অন্দরমহলে প্রতিদিন বিভিন্ন হালকা মৌল থেকে জন্ম নিচ্ছে একের পর এক ভারী মৌল।

তবে ১৯৫০-এর মাঝামাঝি সময়ে একদল জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রথম উপলব্ধি করলেন যে প্রতিটি নক্ষত্র যেন সত্যিই এক একটি আন্তরীক্ষ-আগ্নেয়গিরি! অবশেষে ১৯৫৭ সালে জিওফ্রে বার্বিজ, মার্গারেট বার্বিজ, উইলিয়াম ফোলার এবং ফ্রেড হয়েল যৌথভাবে প্রকাশ করেন নক্ষত্রের অভ্যন্তরে ঘটে চলা পরমাণু-সংশ্লেষণ সম্বন্ধীয় তাদের বিখ্যাত গবেষণাপত্র। লেখক চারজনের পদবীর আদ্যাক্ষর অনুযায়ী যা পরবর্তীতে B^2FH নামে পরিচিতি লাভ করে। এই গবেষণা প্রবন্ধ অনুযায়ী ব্রহ্মান্ডে পদার্থ বলতে একদা ছিল ঘনীভূত হাইড্রোজেন, বিচ্ছিন্ন ভাবে পল্লবগ্রাহী হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছিল হিলিয়াম ও লিথিয়াম। তারপর হাইড্রোজেন ক্রমশঃ আরো ঘনীভূত হতে হতে নক্ষত্রের জন্ম দেয় এবং সেখানকার বিপুল মহাকর্ষীয় চাপে হাইড্রোজেন সংযোজিত হয়ে হিলিয়ামে পরিণত হয় ও নক্ষত্রের প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দিতে থাকে। প্রবন্ধের এই অংশ পর্যন্ত যেন একই জানা কথার পুনরাবৃত্তি! তবে যখন হাইড্রোজেন ফুরিয়ে যায় তখন? আর এখানেই B^2FH-এর কৃতিত্ব বা অবদান। যে নক্ষত্রগুলি যুগ যুগ ধরে হাইড্রোজেন পুড়িয়ে চলছিল সেগুলিতে আরো দ্রুত শুরু হয় এমন সব পারমানবিক প্রক্রিয়া যা কোনো অ্যালকেমিস্ট পর্যন্ত ভাবতে সাহস পাবে না।

একদিকে নক্ষত্রের অভ্যন্তরের সাঙ্ঘাতিক চাপ ও তাপ এবং অন্যদিকে ক্রমহ্রাসমান হাইড্রোজেন ও নিউক্লিও সংযোজনের ফলে

ঘটে চলা পরিবেশগত অস্থিরতা, এসবের মিলিত প্রভাবে হিলিয়াম পরমাণুগুলি নিজেরা সংযোজিত হয়ে যুগ্ম-পরমাণু ক্রমাঙ্ক (even atomic number) বিশিষ্ট মৌল উৎপন্ন করে। আবার কখনো হয়তো সেই সংযোজিত অবস্থাগুলি থেকে প্রোটন বা নিউট্রন বেরিয়ে গিয়ে অযুগ্ম-পরমানু ক্রমাঙ্ক (odd atomic number) বিশিষ্ট মৌল তৈরি হয়। ফলে শীঘ্রই নক্ষত্রের অভ্যন্তরে যথেষ্ট পরিমাণে লিথিয়াম, বোরন, বেরিলিয়াম এবং কার্বন জমা হয়। যদিও বাইরের দিকে তখনো (প্রকৃতপক্ষে একটি নক্ষত্রের পুরো জীবদ্দশায়) হাইড্রোজেনই থাকে। তবে হিলিয়াম এইরকম সংযোজন বিক্রিয়ায় কম শক্তি (হাইড্রোজেনের সংযোজনের সাপেক্ষে) নির্গত করে। তাই হিলিয়াম সংযোজন ঘটতে শুরু করা নক্ষত্ররা অধিকাংশই মোটামুটি ভাবে আরো দশ কোটি বছর বেঁচে থাকে। কিছু কিছু ছোটো নক্ষত্রের (তারার) আবার এই অবস্থায় মৃত্যুও ঘটে। এইসব তারার ভেতরে থাকে কার্বনের গলিত ভর

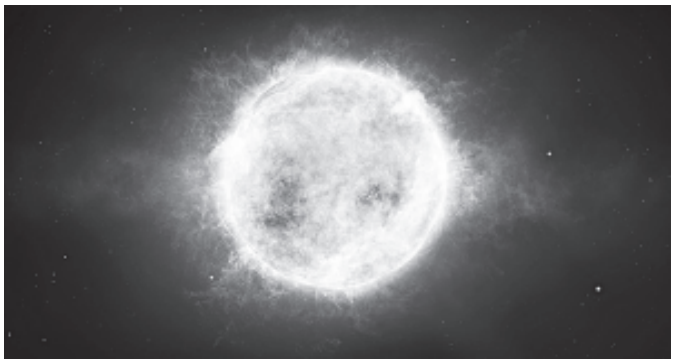

শ্বেতবামন

(molten mass), যারা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে শ্বেতবামন[১] (white dwarf) নক্ষত্র বলে পরিচিত। তবে ভারী নক্ষত্রদের ভবিষ্যত একটু অন্যরকম। সূর্যের তুলনায় আটগুন বা তার চেয়েও বেশি ভারি নক্ষত্ররা কেবল কার্বনেই থেমে থাকে না, এরা কার্বনকে পিষে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন থেকে শুরু করে ম্যাগনেশিয়াম পর্যন্ত আরো ছয়টি মৌল তৈরি করে ফেলে। ঐসব করতে আরো কয়েকশত থেকে হাজার বছর পেরিয়ে যায়। এই পর্যন্ত হয়ে অনেকের জীবনকাল থেমে গেলেও কিছু কিছু অতি দানবীয় নক্ষত্র (যাদের অভ্যন্তরের তাপমাত্রা কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ কোটি ডিগ্রী) এই ম্যাগনেশিয়াম পর্যন্ত তৈরি হওয়া মৌলগুলিকেও খরচ করে ফেলে আরো বেশি পরমাণু ক্রমাঙ্কের মৌল তৈরিতে। এই ভাবে এরা কাটিয়ে ফেলে আরো কয়েক লক্ষ বছর। B^2FH-এর সাহায্যে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এভাবেই নক্ষত্রলোকে লিথিয়াম থেকে আয়রন পর্যন্ত চব্বিশটি মৌলের সৃষ্টি রহস্য ব্যাখ্যা করতে পারেন। তাই যদি কোনো তারায় কোনোভাবে আয়রনের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা নিঃসংশয় হতে পারেন তবে সেখানে আয়রনের চেয়ে কম পরমাণু ক্রমাঙ্ক বিশিষ্ট মৌলগুলিকে নিয়ে ওনারা আর চিন্তিত থাকেন না।

কিন্তু আমাদের জানা অন্যান্য মৌলগুলির বেলায়? ওরাও কি একইভাবে নক্ষত্রলোকে নিউক্লিও সংযোজন প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়? এর উত্তর হল 'না'। জটিল গাণিতিক হিসাবে দেখা গেছে পারমানবিক সংযোজনে ছাব্বিশতম মৌল আয়রন তৈরি হলে আর কোনো শক্তি মুক্ত

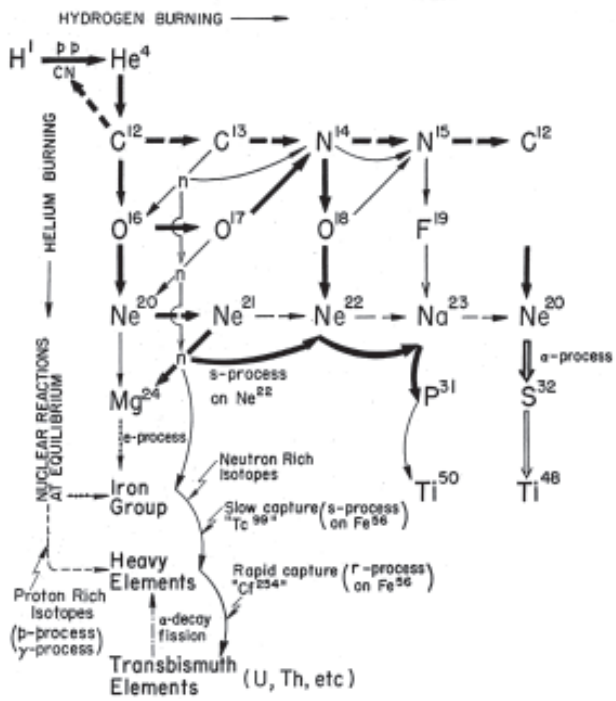

নক্ষত্রের মধ্যের সংশ্লেষের নিউক্লীয় পদ্ধতির চিত্র

হয় না, বরং শক্তি গৃহীত হয়। তাই আয়রনই হল কোনো নক্ষত্রের জীবদ্দশায় উৎপন্ন সর্বশেষ মৌল। প্রকৃতপক্ষে নক্ষত্রের অভ্যন্তরে আয়রন সরাসরি নিউক্লিও সংযোজনের ফলে উৎপন্ন সর্বশেষ মৌল। নক্ষত্রের অভ্যন্তরে আয়রন সরাসরি নিউক্লিও সংযোজনের ফলে উৎপন্ন হয় না। চোদ্দতম মৌল হিসাবে উৎপন্ন দুটি সিলিকন পরমাণু প্রথমে পরস্পর সংযোজিত হয়ে আঠাশতম মৌল নিকেল উৎপন্ন করে। কিন্তু অত্যন্ত অস্থায়ী এই নিকেল পরমাণু মুহুর্তে ভেঙে গিয়ে স্থায়ী আয়রন পরমাণুতে পরিণত হয়। কখনো কখনো অস্থায়ী নিকেল আবার প্রয়োজনীয় নিউট্রন সংগ্রহ করে স্থায়ী নিকেলে পরিণত হয় বা ভেঙে গিয়ে আয়রন ও নিকেলের মাঝের মৌল কোবাল্ট গঠন করে। তবে নক্ষত্রলোকে মৌলদের মধ্যে পরিমাণের বিচারে আয়রনের প্রাচুর্য্য অন্যান্য ধাতুদের তুলনায় বেশি। তাই নক্ষত্রমণ্ডলগত বিভিন্ন অঞ্চল এমনকি পৃথিবীসহ মহাবিশ্বের অনেক বস্তুর কেন্দ্রের অন্যতম প্রধান উপাদান আয়রন। হাইড্রোজেন ছাড়া পরবর্তী মৌল অর্থাৎ হিলিয়াম থেকে শুরু করে নিকেল পর্যন্ত যারা সরাসরি নিউক্লিও সংযোজন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় তাদের প্রাথমিক মৌল (Primary Elements) বলে। তবে নিকেল-পরবর্তী মৌলরা, যারা নিকেলের চেয়ে ভারী তারা কিন্তু মহাজাগতিক বিস্ফোরনে উৎপন্ন হয় প্রধানতঃ দ্রুত নিউট্রন সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় যা r-process (এখানে rapid বোঝাতে 'r' অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়) নামে পরিচিত। তাছাড়া প্রোটন সংগ্রহ (rp-process) এবং আলোকীয় বিভাজন (Photodisintegration বা p-process) প্রক্রিয়াতেও ভারী মৌলগুলির কম নিউট্রনযুক্ত আইসোটোপ (একই মৌল কিন্তু যাদের ভরসংখ্যা আলাদা তারা পরস্পরের আইসোটোপ) উৎপন্ন হয়।

পরবর্তী সংখ্যায় সমাপ্য

E.mail.acnbu13@gmail.com • M : 9434377067

সংবাদ

দূষণে জেরবার দিল্লি

২০১৬ সালে দিল্লিতে ধোঁয়াশার জন্য রঞ্জি ট্রফির ১ জোড়া ম্যাচ বাতিল হয়েছিল। জাতীয় পরিবেশ আদালত, কেন্দ্রীয় সরকার ও দিল্লির সরকারকে দূষণ প্রতিরোধে সবরকম ব্যবস্থা নেবার নির্দেশ দিয়েছেন। বেশ কিছুদিন স্কুলের পঠনপাঠন বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিল।

সরকারি রিপোর্টে জানা যায় গত ২ বছরে পরিবেশ সংক্রান্ত সেস থেকে দিল্লি সরকার ৭৮৭ কোটি টাকা আয় করেছেন, অথচ দূষণ প্রতিরোধে মাত্র ৯৩ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন।

ডিসেম্বর '১৭-এর প্রথম সপ্তাহে ভারত-শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট ম্যাচ ধোঁয়াশার জন্য ২০ মিনিট বন্ধ রাখতে হয় এবং বেশিরভাগ খেলোয়াড়রা মুখে মাস্ক পড়ে মাঠে নামেন। বিশ্বক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা (আইসিসি) দিল্লির টেস্টের সময় বাতাসের দূষণ কি পরিমাণ ছিল সে নিয়ে ডাক্তারদের মতামত জানতে চেয়েছেন। ক্রিকেটের ইতিহাসে ১৪০ বছরের মধ্যে এই প্রথম দূষণের জন্য সাময়িকভাবে খেলা বন্ধ রাখতে হয়।

সারাদেশ জুড়ে পরিবেশ ভয়ঙ্করভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। ফলে দূষণ সমস্যা ক্রমশ আমাদের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তুলছে। তাই পরিবেশ রক্ষা করা আজ আমাদের সকলের বাঁচার লড়াই। আসুন সকলে মিলে এই লড়াইয়ে সামিল হই।

নামেরি ন্যাশনাল পার্কে হাতির মৃত্যু

অসমের শোনিতপুর জেলার নামেরি ন্যাশনাল পার্কে বালিপাড়ার কাছে ট্রেনের ধাক্কায় ৬টি হাতি মারা যায়। বনদপ্তর সূত্রে জানা যায় হাতিগুলি খাবারের খোঁজে অরুণাচল প্রদেশের দিকে যাচ্ছিল। কুয়াশার কারণে ট্রেনচালকের নজর এড়িয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত রেলপথে অসমে ২২৫টি হাতির মৃত্যু হয়েছে। রেলপথে এই হাতিমৃত্যুর ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গেও প্রায়ই ঘটে থাকে। বনদপ্তর ও রেল প্রশাসনকে এনিয়ে গঠনমূলক উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন যাতে হাতিমৃত্যু কমানো যায়।

হরিণঘাটায় প্যাঁচা উদ্ধার

৮ নভেম্বর হরিণঘাটা (নদিয়া) ফার্ম এলাকার গীতা রায়ের কোয়ার্টার থেকে তিনটি প্যাঁচা বনদপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিজ্ঞান দরবারেরা সদস্যদের প্রচেষ্টায় এই প্যাঁচাগুলি রক্ষা পায়।

ভাবাদীঘি বাঁচুক, রেলপথ হোক

১ নভেম্বর হুগলি জেলার চুঁচুড়া ঘড়িরমোড়ে সারাদিনব্যাপী 'ভাবাদীঘি বাঁচুক, রেলপথ হোক' এই দাবিতে এক গণঅবস্থানের আয়োজন করেন হুগলি জেলা এপিডিআর, বিজ্ঞান ও পরিবেশ সংগঠনগুলির যৌথকমিটি সহ বিভিন্ন সংগঠন। গণস্বাক্ষর, পোস্টার প্রদর্শনী সহ পরিবেশ ও মানবাধিকার কর্মীরা সভায় বক্তব্য রাখেন। হুগলি জেলার ভাবাদীঘি অঞ্চলে সাধারণ মানুষ এই অবস্থানে অংশগ্রহণ করেন। জেলাশাসকের কাছে এক স্বারকলিপি প্রদান করা হয়।

বিষ্ণুপুরের বাঁধগুলি (দিঘী) দূষণে বিপর্যস্ত

লালবাঁধ

বাঁকুড়া জেলায় মল্লরাজারা বিষ্ণুপুর শহরে ৭টি বাঁধ কৃত্রিমভাবে তৈরি করেছিল। পরিবেশকে নির্মল ও পানীয় জলাভাব দূর করার জন্যই ৭টি বাঁধ (যথা, পোকাবাঁধ, লালবাঁধ, যমুনাবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, গাতাতবাঁধ, শ্যামবাঁধ ও কালিন্দীবাঁধ) তৈরি করা হয়েছিল। সমীক্ষায় জানা যায় বাঁধগুলি মজে যাচ্ছে। পোকাবাঁধ ভীষণভাবে দূষিত। বিষ্ণুপুরের সামগ্রিক পরিবেশকে নির্মল রাখার ক্ষেত্রে এই বাঁধ বা জলাশয়গুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশ দপ্তরের এই বিষয়ে নজর দেওয়া জরুরি।

M : 9073401337
9339228658

D. K. DAS & CO.

493, MASJID BATI ROAD
HARALAL NAGAR
P.O. - KANCHRAPARA, DT. NORTH 24 PGS, PIN : 743145, W.B.

GENERAL ORDER SUPPLIER & GOVT. CONTRACTOR

Suppliers of all Kinds Steel Wooden Furniture & Sanitory Items

VAT No. 966-6085-066

G.S.T. Regd. No. 19AKYPD6147KIZF

ADMISSION OPEN

Session : 2017-18
Kanchrapara
Albatross School
Play group to class-viii
digi school
new building
Ph. 8013191616
03325856660

WATER SOLUTION

প্লাম্বিং ও স্যানিটারির সমস্ত দ্রব্য পাওয়া যায়।

ধানকল • মোবাইল : 8240665747

All kinds of Plumbing and Sanitation items available here.

DHANKAL • Mobile : 8240665747

জানো কি?

বিজয় সরকার

❑ থ্রি-পিন প্লাগের তিনটি গর্তের কেন্দ্র যোগ করলে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ পাওয়া যায় কেন— সমবাহু ত্রিভুজ হয় না কেন?

এটা করা হয়, ঠিক ঠিক পিন ঠিক ঠিক গর্তে ঢোকানোর ব্যাপারটা নিশ্চিত করার জন্য। যদি ত্রিভুজটি সমবাহু হত এবং তিনটি পিনই সমান মাপের হত, তাহলে প্লাগটি ঘুরিয়ে তিন রকমভাবে সকেটে বসান যেত। ফলে লাইভ, নিউট্রাল ও আর্থ ওয়ারের কানেকশনগুলি ওলট-পালট হয়ে যেত। কিন্তু সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হওয়ার জন্য শুধুমাত্র একভাবেই প্লাগ সকেটে ঢুকবে।

❑ তিনপেয়ে টেবিল ও চারপেয়ে টেবিল— কোনটি বেশি কাজের উপযোগী?

অবশ্যই তিনপেয়ে টেবিল। টেবিল থাকে ঘরের মেঝের উপর। চারপেয়ে টেবিলের কোনো একটি পা সামান্য ছোট বা বড় হলে অথবা মেঝের তলে কোনো বিচ্যুতি থাকলে টেবিলটি নড়বড়ে হবে। কিন্তু

তিনপেয়ে টেবিলের ক্ষেত্রে সে সুযোগ নেই। তিনপেয়ে টেবিলের পা অথবা মেঝের বিচ্যুতির জন্য টেবিলের উপরিতলে সামান্য ঢাল থাকবে কিন্তু নড়বড়ে হবে না।

❑ কর্পূর কী?

কর্পূর সাদা দানাদার পদার্থ। এর মৃদু সুগন্ধ রয়েছে। জলে ফেললে কর্পূর গুলে যায়। বাতাসে রাখলে ধীরে ধীরে উবে যেতে থাকে। কর্পূর একটি চিরসবুজ গাছ। এই গাছে ছোট ছোট ফিকে সবুজ ফুল হয়, কিন্তু ফুলের কোনো পাপড়ি থাকে না। ফল ছোট ছোট কুলের মতো দেখতে। কর্পূর গাছ তিরিশ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। কর্পূর গাছ কেটে ছোট ছোট টুকরো করে বাষ্পের সাহায্যে অবিশুদ্ধ কর্পূর নিষ্কাষন করা

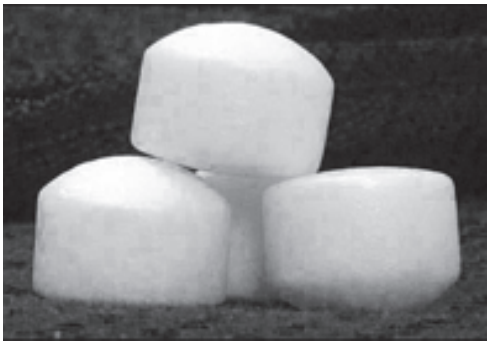

হয়। পরে এর সঙ্গে চুন, কাঠ কয়লা, আর নুন মিশিয়ে বিশুদ্ধ করা হয়। তার থেকে পাওয়া যায় সাদা চকচকে দানা। আজকাল তারপিন ও ইউক্যালিপটাস তেল থেকেও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সিনথেটিক কর্পূর তৈরি হচ্ছে।

❑ সেফটি ট্যাঙ্কের ঢাকনা গোল হয় কেন?

সেফটি ট্যাঙ্ক মুখ থেকে ট্যাঙ্কের ঢাকনা একটু বড় মাপের হয় এবং গোল মুখে গোল ঢাকনা চমৎকার ভাবে বসে যায়, ঢাকনা যেমন-তেমন ভাবে রাখি না কেন। কিন্তু ঢাকনা যদি চারকোনা হত তাহলেও তো ট্যাঙ্কের চৌকো মুখে ভালভাবে বসবে আশা করা যায়। কিন্তু ট্যাঙ্কের

মুখ বা ঢাকনা চৌকো হয় না কেন? ট্যাঙ্কের মুখ যদি চৌকো হত তাহলে দেখা যেত যে চৌকো ঢাকনাটি দাঁড় করিয়ে চৌকো মুখে কোনাকুনি রাখলে গলে যাচ্ছে। কিন্তু গোল মুখে গোল ঢাকনা গলে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। একই কারণে আমাদের বাড়ির বেশিরভাগ কৌটোর মুখও গোল হয়।

E.mail.bijoysarkar4786@gmail.com
• *M : 9432335882*

সু ব্র ত রু দ্র

ধানের গান

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কীসে

কীসের খাজনা কীসের বাজনা
বুলবুলিরা কই
মানুষে মারে ধানের প্রাণ
পড়ে রইল মই।

সেই বুলবুলির মধ্যে এক ধানীরঙা বুলবুলি
বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়
রোজ গভীর রাত হ'লে বলে ভোর হয়ে গেছে—
এক বাঙালি রাধাতিলক ধান খুন করেছে
দুই বাঙালি মিলে চিনি কামিনী, কনকচূড়, সুবাসিতা
তিন ধানকে মেরে ফেলেছে
পাঁচ বাঙালি জুটে মেরেছে তুলসীমঞ্জরী, কালো নুনিয়া,
দানাগুড়ি, রাঁধুনিপাগল, সুন্দরীদের
জলের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে বাড়তো যারা জলকামিনী,
জলজাবড়া, লক্ষ্মীদীঘল, ভাসা মানিক,
বোনাঝুপি তাদের গোড়ার জল কেড়েছে দশ বাঙালি
কম জলেতে কষ্ট সয়ে মাটি কামড়ে থাকতো যারা
ভূতমুড়ি, সাদা কয়া, আসানলিয়া, সত্তরি
তাদের জলে ডুবিয়ে খুন করেছে দশ বাঙালি
ধানগুলো সব মরে গিয়ে ভূত হয়ে আজ ঘুরছে হাওয়ায়
যদি আবার ফিরতে পারে বাংলা দেশের মাটির মায়ায়

একদিন পৃথিবীর মেয়ে সুধন্যা
ফিরিয়ে দেবে ধানের প্রাণ
ঝাঁঝি ধানের ফেনা ভাত
কলাপাতায় সেই খাওয়াবে

কলাপাতায় সুগন্ধি ভাত
তাতে পড়লো ঘি
সামনে বসে খাওয়ায় আমায়
ভালো মানুষের ঝি।

জ গ ন্ম য় ম জু ম দা র

ছাতিম ফুলের রেণু

♂ — চলো ছাতিমতলায়
♀ — না, যাবো না ছায়ায়।
♂ — তবে চলো স্টেশনে, চাতালে
♀ — ট্রেন থেকে দেখবে সকলে।
♂ — দেখুক
♀ — দেখবে অসুখ?
♂ — ছাতিম ফুলের গন্ধে মেশানো মাদক
অন্ধকারে হবো একটু চাতক
♀ — হওয়াচ্ছি দাঁড়াও—গন্ধটা উগ্র বড়ো
♂ — মিষ্টি মিষ্টি একটু ঝাঁঝালো
♀ — সয়না, এ্যালার্জি হয়
♂ — হাসি না হাঁচি পায়?
♀ — ছাতিম ফুলের রেণু আসলে তো খল
♂ — তুমি যদি অগ্নি হও, আমি হই জল
♀ — তবে চলো ছাতিমের রেণু থেকে দূরে
যেখানে বিশুদ্ধ হাওয়া আসে ঘুরে ঘুরে।
♂ — তাহলে তো যেতে হয় অন্য গ্রহে অন্য কোনোখানে
♀ — পৃথিবী ছাড়ার কথা ভাবি না জীবনে।
♂ — যা হবে এখানে হবে, এইখানে প্রিয় পরিবেশ
♀ — তব সাধনসঙ্গী হবো, নেব বাউলনি বেশ।

নি র্মা ল্য দা শ গু প্ত

গোপন ব্যথা

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে
সূয্যি গেল পাটে,
এখন কিন্তু খুকুরা আর
যায় না দীঘির ঘাটে।

দীঘির মধ্যে এখন তো আর
কালো জল নেই,
জলের মধ্যে আবর্জনা
ভাসতে থাকে সেই।

আঁধার হলে খুকু কি আর
বাইরে যেতে পায়!
এখন শুধু বাইরে বের'য়
সাপ-সাপিনী হায়।

পদ্মদীঘির নোংরা জলে
প্রমোটারের থাবা,
জল ছিলো, না ভাগাড় ছিলো
এই প্রশ্নেই ধাঁধা।

কে দেখেছে, কে দেখেছে
কেউ কি দেখেছে?
রতন-মাণিক কাছেই ছিলো
ছিঁড়ে খেয়েছে।

তারপরে কি হলো কিছু,
জানতে পারলো কেউ!
আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা
শহর জুড়ে ফেউ।

শব্দের খোঁজে ৫ : উদ্ভিদ

পলক বন্দ্যোপাধ্যায়

১		২		৩		৪		৫
				৬				
৭			৮				৯	
					১০	১১		
১২	১৩							১৪
			১৫	১৬				
১৭							১৮	
			১৯		২০			
২১					২২			

পাশাপাশি :

২. ভারতবর্ষের জাতীয় ফুল।
৪. হেমন্তকালে উৎপন্ন ধান বিশেষ।
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ছোট গল্প ''ঘাটের কথা''র নায়িকা, ফুলের অপর নাম।
৭. কালো রঙের গোলাকৃতি ও ছোট ঝাল মশলা বিশেষ।
৯. — ক চাঁপা, ফুল বিশেষ। দু অক্ষরে শূণ্যস্থান পূরণে 'সোনা' বোঝায়।
১০. ফিকে বেগুনি রং এর ফুল বিশেষ, শিব ঠাকুরের প্রিয় ফুল।
১২. সবজি বিশেষ যা তোলার থেকে খাওয়া ভালো।
১৫. আনাজ, ব্যঞ্জন রাঁধার উপযোগী ফুলমূলাদী।
১৭. বর্ধমান জেলার এই স্থানের ডাঁটা বিখ্যাত।
১৮. এই মাটিতে ধান গাছের ফলন ভালো হয়।
১৯. টক রসযুক্ত অম্বল রেঁধে খাওয়ার ফলবিশেষ, তিন অক্ষরে নাম প্রথম দুইয়ে বাড়ির মাথা, শেষ দুইয়ে যা লতিয়ে ওঠে।
২১. সালোক ——।
২২. পাতায়, পাতায় শরম/লজ্জা।

উপর-নীচ :

১. পাঁচ অক্ষরের ফুল বিশেষ, প্রথম দুইয়ে আসবাব বানানোর উপকরণ, শেষ তিনে সুগন্ধ ফুল, যা মোগল বাদশাহরা ভালোবাসতেন।
২. হলুদ রঙের সুগন্ধ ফুল, পদক্ষেপ।
৩. মাদার গাছের ফল।
৪. 'ফলের রাজা' বলা হয়।
৫. —— তারা ফুল, চক্ষুর আরেক নাম।
৮. কাপড় কাচার কাজে ব্যবহৃত ছোট ফল বিশেষ।
৯. যে উদ্ভিদের প্রধান অংশ মাটির নীচে থাকে।
১১. —— পানা, জলজ উদ্ভিদ বিশেষ।
১৩. সবজি শ্রেণির ফল বিশেষ, বিলাতি বেগুন।
১৪. শেফালিকা ফুল বা তার গাছ।
১৬. আম্রফুলের গাছ।
১৭. তুলো বিশেষ।
১৮. পাতা, কিশলয়।
১৯. কৃষিকর্ম।
২০. ''—— গাছ, এক পায়ে দাঁড়িয়ে, সব গাছ ছাড়িয়ে ——''।

শব্দের খোঁজে ৪ : প্রাণী

১ শি	২ বা		৩ কে		৪ ছি		৫ চা
	ন		য়া		৬ প	৭ শ	ম
৮ আ	র	শো	লা			জা	
র্মা				৯ ভী	১০ ম	রু	১১ ল
ডি					ধু		ক্কা
১২ লো	হি	১৩ ত		১৪ সা	প		পা
		১৫ স	ঙ্ক	র			য়া
১৬ খে	চ	র		স		১৭ ম	রা

কার্টুনিস্ট : সৌরভ মুখার্জী ● M : 8961401423

পত্রিকা যোগাযোগ

চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9332283356 • জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব M. 9232387401 • প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা M. 9732681106 • কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9477589456 • তপন চন্দ, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার M. 9733153661 • কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম M. 9434686749 • গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ M. 9593866569 • পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ, বারাকপুর M. 9331035550 • শিয়ালদহ স্টেশন, বৈচিত্র্য, পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু ও মনীষা (কলেজ স্ট্রিট) • স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নয়ন M. 9153320581

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পো ঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো ঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস ঃ রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ ● সম্পাদক ঃ তাপস মজুমদার। ফোন ঃ ৯৮৭৪৭৭৮২১৬/৯৪৭৪৩৩০০৯২
সম্পাদকমণ্ডলী ঃ বিজয় সরকার, প্রবীর বসু, শিবপ্রসাদ সর্দার, সম্রাট সরকার, অনুপ হালদার, সুজয় বিশ্বাস, বিবর্তন ভট্টাচার্য
E-mail : bijnandarbar1980@gmail.com/ganabijnan@yahoo.co.in

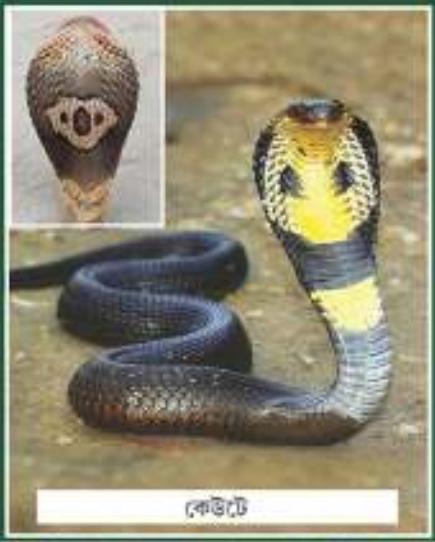
কেউটে

গোখরো

শঙ্খচূড়

কালাচ

শাঁখা মুটি

চন্দ্রবোড়া

গেছোবোড়া

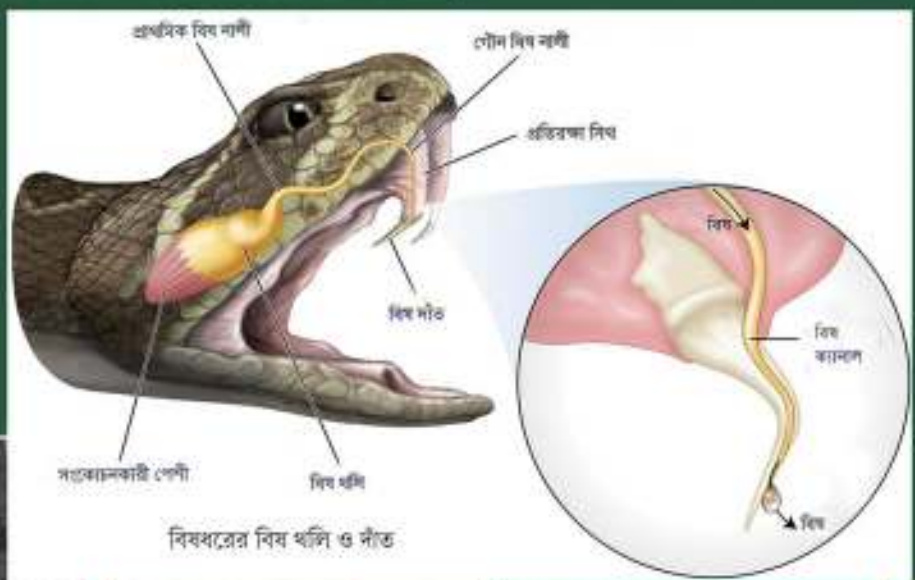

বিষধরের বিষ থলি ও দাঁত

থক নাকেয়ালা সামুদ্রিক সাপ

বিষধরের দংশন চিহ্ন

চন্দ্রবোড়ার দংশন ফল